//////////////////

ব ন্ধু প ত্নী

//////////////////

বন্ধুপত্নী

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী

নাভানা

৪৭ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলকাতা ১৩

বুলুকে—

//////////////////////////////////

বন্ধুপত্নী

//////////////////////////////////

এই গল্প আমার স্ত্রী রেবাকে নিয়ে হওয়া উচিত ছিলো, কিন্তু তা হয়নি। হ'লো আর-একজনকে নিয়ে, বিশ্বাস করা যায় না এমন অদ্ভুতভাবে। এক বর্ষার রাত্রে।

বলবেন, এমন হওয়া উচিত না। উচিত-অনুচিতের তত্ত্ব আলোচনা করলে অবশ্য গল্প হয় না। উচিত তো না-ই আমার স্ত্রী রেবার কাহিনীও আপনাদের কানে তোলা। কিন্তু উপায় কি।

রেবাকে নিয়ে আরম্ভ করা যাক।

হ্যাঁ, এক গ্রীষ্মের ছুটিতে ও আমার কাছে এসেছিলো। এই শেষ আসা। আমাদের বিয়ের পর এক বছরের মধ্যে অবশ্য আরো দু-তিনবার রেবা ছোটো-বড়ো ছুটিগুলো আমার কাছে এসে কাটিয়ে গেছে। যেমন পুজোর এক মাস, বড়োদিনের সাত দিন, গুডফ্রাইডে— ইস্টার মন্‌ডে— পয়লা বৈশাখ— সংক্রান্তি ইত্যাদি মিলিয়ে ন'দিন। আর-এক জায়গায় ওর চাকরি। স্কুলের টিচার। আমি আছি কলকাতায়। আমার পক্ষে সম্ভব ছিলো না বছরে দু-বার তিনবার ওর কাছে ছুটে যাওয়া। চাকরিটাই এমন। বিয়ের সময় আঠারো দিনের ছুটি ব'লে-ক'য়ে ওপর-ওয়ালার কাছ থেকে মঞ্জুর করিয়েছিলাম। বছর না পুরতে আবার ছুটি চাওয়া তো অসম্ভবই, বছর অতিক্রান্ত হওয়াব পবও শিগগির আর ছুটি মিলতো কিনা সন্দেহ। আপিসে এমন লোকও আছে যাদের তিন কি সাড়ে তিন বছর পার হ'য়ে গিয়েও ছুটি মিলছে না। হাব-ভাব দেখে মনে

হয় তাদের ছুটির দরকার নেই। দরকার কি আর হয় না! হয়তো একবার— দু-বার— তিনবার আবেদন-নিবেদন ক'রে যখন বুঝেছে একটানা একমাস কি একুশ দিন কর্মচারীদের অদর্শন তাঁর পক্ষে সহ্য করা অসম্ভব, প্রায় হৃদয়বিদারক ঘটনার মতো, তখন কর্মচারীরা ওপর-ওয়ালার কাছে ছুটি চাওয়া ছেড়ে দিয়েছে। অসুখ-বিসুখ? সে-কথা অবশ্য আলাদা। খুব বেশিদিন রোগে ভুগে কি ঘন-ঘন সর্দি-কাশি-পেটের অসুখে কামাই ক'রে কে কবে মার্চেণ্ট আপিসে চাকরি রাখতে পেরেছে আপনাদের অজানা নেই।

রেবা এ-সব বুঝতে পেরেছিলো।

হ্যাঁ, আমার এবং আমার চাকরির অবস্থা।

শেষবার, অর্থাৎ সামারের ছুটিতে এসে মুখ কালো ক'রে ও বলছিলো আর খুব শিগ্‌গির তার পক্ষে কলকাতায় আসা সম্ভব হবে না, পুজোতেও না, ট্যুইশনি নিয়েছে। তা ছাড়া, সব চেয়ে বড়ো কথা, বার-বার আসা-যাওয়া ক'রে ক'মাসেই সে ঋণগ্রস্ত হ'যে পড়েছে। স্কুলের চাকরি। কত আর মাইনে দেয় কর্তারা। সুতরাং রেলভাড়া বাবদ যদি দু-চার মাস পর-পর পঁচিশ-ত্রিশ টাকা বেরিয়ে যায় তবে তার ভাত খাওয়া হয় না। 'আর, তোমার পক্ষেও সম্ভব না শিগ্‌গির বেনারস যাওয়া। সুতরাং—'

সুতরাং এক চালার নিচে থেকে এক হাঁড়ির ভাত খেয়ে দাম্পত্য-জীবন কাটানো শিকেয় তোলা রইলো।

কি, আমি সাহসই পাইনি রেবাকে প্রস্তাব দেওয়ার যে, চাকরি ছেড়ে দিয়ে তুমি এখানে থাকো।

'আমার ট্রেনিং পাস না-করাটা কত বড়ো ভুল হয়েছে আজ বুঝতে পারছি।' রেবা শাড়ির আঁচল দিয়ে চোখ মুছছিলো, 'আমি কী জানতাম না বিয়ের পর এ-অবস্থা হবে। কিন্তু কাকু তো আর তা

দেখেননি, মন্ত্র পড়িয়ে কোনোমতে পার করিয়ে দেবার জন্যে চোখে ঘুম ছিলো না। আর থাকবেই-বা কী ক'রে। আমি বাড়তি লোক, নিজের এতগুলো সন্তান, চাকরিও তেমন হাতিঘোড়া কিছু না। বাবা মরবার পর ওঁর সংসারে আমাদের যেদিন ঠাঁই নিতে হয়েছিলো সেদিনই জানতাম কত বড়ো অবিচার করা হ'লো আর-একটা লোকের ওপর। তবু তো তিনি ধারকর্জ ক'রে আমার পরীক্ষার ফীজ্‌ যোগাড় করলেন। না হ'লে বি. এ. পাস করাই আমার কপালে ঘটতো না।'

এই অবধি এসে রেবা থেমেছিলো।

'বেশ তো, তুমি না-হয় ট্রেনিংটা পাস ক'রে নাও, আমি দেখি ইতিমধ্যে চেষ্টা-চরিত্র ক'রে কলকাতার কোনো ইস্কুলে যদি তোমার একটা—'

এত বড়ো চোখ করেছিলো স্ত্রী। হ্যাঁ, বিয়ের পর দ্বিতীয়বার বড়োদিনের ছুটি কাটাতে যখন ও আসে।

'অদ্ভুত স্বার্থপর তুমি।' মনে হয়েছিলো বুঝি সেদিনই সে বাক্স গুছিয়ে আবার বেনারস রওনা হয়। বললো, 'এতটা নীচ হ'তে আমি পারবো না। চাকরি পেয়ে মাকে নিয়ে সেখানে আলাদা বাসা করেছি, কিন্তু তা ব'লে কাকুর পরিবারের ভালো-মন্দ সুখ-দুঃখ জলে ভাসিয়ে দিয়ে আমি স্বামী-সঙ্গ করতে আজই এখানে ছুটে আসবো— ম'রে গেলেও তা পারবো না। তারপর মা ? মা-ও একটা সমস্যা। রোজ সন্ধ্যায় বিশ্বেশ্বরের মন্দির দর্শন করতে না পারলে ম'রে যাবে— কলকাতায় এসে তার পক্ষে থাকা অসম্ভব, বিয়ের রাত্রেই আমার কানে-কানে বলছিলো।'

আমি চুপ ছিলাম। কাকুর পরিবার। মা। বিশ্বেশ্বরের মন্দির। ট্রেনিং নেওয়া।

গুডফ্রাইডের ছুটিতে ও এলো।

সে-বার কলকাতার জলে ওর নিজের বদ্-হজম, গা-হাত ব্যথা এবং এ-সব অস্বস্তির দরুন রাত্রে অনিদ্রা।

আমি বললাম, 'না-হয় কালকের মেলেই তুমি ফিরে যাও, আরো তো ছুটির তিন-চার দিন আছে। সেখানে গিয়ে একটু রেস্ট্ নিয়ে তারপর কাজকর্ম আরম্ভ করতে পারবে।'

তিন দিন না। ছুটির একদিন হাতে রেখে ও ফিরে গেছে।

তারপর গ্রীষ্মের ছুটিতে এসে প্রথম দু-দিন ওর ব্যস্ততার মধ্যে কাটলো। এটা-ওটা কেনাকাটা করলো— দোকানে-দোকানে ঘুরে। ওর জুতো শাড়ি, বিধবা মা-র জন্যে কাপড়চোপড়, সেখানে ঘরের দরজা জানলার পর্দাগুলো ছিঁড়ে গিয়েছিলো, তাই নতুন পর্দা কেনা হ'লো কুড়ি টাকার। একটা ইলেকট্রিক স্টোভ, বড়ো একটা স্টীলের ট্রাঙ্ক, দুটো চামড়ার স্যুটকেস এবং তিনটে মাঝারি সাইজের পাপোশ্। টুকিটাকি জিনিসও বিস্তর ছিলো। সাবান তেল স্নো ক্রিম পাউডার রাইটিং-প্যাড জেলির শিশি মাখনের টিন এবং কিছু ওষুধপত্র। ওষুধগুলো ওর নিজের জন্য কি মা-র জন্য আমি প্রশ্ন করিনি। করবো কি। সারাদিন ঘুরে জিনিসপত্র কেনাকাটা ক'রে ঘরে ফেরার পর এমন ক্লান্ত হ'যে ও বিছানায় এলিয়ে পড়েছিলো যে কাছে গিয়ে কথা বলতে আমার সাহসে কুলোয়নি। হ্যাঁ, ক্লান্তি ওর চোখে-মুখে বেশি প্রকট হ'য়ে উঠেছিলো। এবং পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে চা খেতে ব'সে ও আসল কথাটা তুললো। খরচপত্র। দু-চার মাস পর-পর এ-ভাবে কলকাতায় স্বামীর কাছে আসতে হ'লে ও সর্বস্বান্ত হ'য়ে পড়বে। সুতরাং আর শিগ্গির—

গ্রীষ্মের ছুটির তিনদিন আমার কাছে কাটিয়ে পঁচিশ দিন হাতে রেখে রেবা ফিরে গেলো। সত্যি তার বিশ্রামের দরকার। স্কুল খুললে আবার

গলা ফাটিয়ে চিৎকার ক'রে মেয়েদের আকবর বাদশা আর তৈমুরলঙের জীবনী শেখাতে হবে।

আমার জুতো নেই, গেঞ্জি ছিঁড়ে গেছে, একটিমাত্র শার্ট বাড়িতে সাবান দিয়ে কেচে কোনোরকমে কাজ সারা হচ্ছিলো ব'লে সেটার শাদা রং ম'জে গিয়ে মেটে হলদে রং ধরেছে। রেবা লক্ষ্য করছিলো কিনা জানি না। কিন্তু তা নিয়ে আমি মোটেই মাথা না ঘামিয়ে বরং যতটা সম্ভব হাসিখুশি থেকে ওর জিনিসপত্র বাঁধা-ছাঁদায় সাহায্য করলাম, ছুটে গিয়ে ট্যাক্সি ডেকে নিয়ে এলাম এবং গাড়িতে তুলে দিতে শেষ পর্যন্ত স্টেশনেও গেলাম।

'বাই— বাই।' হাত তুলে ইংরেজি কায়দায় ও বিদায় নিলো। 'বাই— বাই।' আমি হাসিমুখে মাথা নেড়ে প্রত্যাভিনন্দন জানালাম। সিটি দিয়ে গাড়ি ছেড়ে দিলো। রেবা আর আসেনি। আমার স্ত্রী।

এখন আসল গল্পে আসা যাক।

ভীষণ বৃষ্টি হচ্ছিলো ক'দিন ধ'রে। সর্দি-কাশিতে ভুগে আমি একাকার। দু-দিন আপিস কামাই হ'য়ে তৃতীয় দিন চলছে। এমন সময় দুপুরবেলা হুড়মুড় ক'রে এসে ঘরে ঢোকে সুবিনয়। আমার বন্ধু। মাথা ও কান বেয়ে টপটপ জল ঝরছিলো। গায়ের জামা খুলে ফেলে হাত বাড়িয়ে আমার ময়লা তোয়ালেটা তাড়াতাড়ি টেনে নিয়ে সে মাথা ও ঘাড় মুছলো।

'কী ব্যাপার?'

'তোকে দেখতে এলাম।' সুবিনয় আমার পাশে বসলো।

এখানে ব'লে রাখি, রেবাকে শেষবারের মতো বেনারস এক্সপ্রেসে তুলে দিয়ে এসে আদ্যোপান্ত সুবিনয়কে সব বলেছিলাম। নম্র নিরীহ

গোবেচারা মানুষ এবং ঘরের ইঁট-কাঠকে যদি আমার বিশ্বাস করতে বাধতো স্থবিনয়কে কিছু বলতে আমার আটকাতো না। আজ অবশ্য আমি গলা বড়ো ক'রে স্বামী-পরিত্যাগকারিণী রেবার কাহিনী আপনাদের শোনাচ্ছি। আমার খারাপ না লেগে বরং ভালোই লাগছে। কিন্তু সেদিন ?

আমার ভয় ছিলো পাছে কেউ টের পায়।

স্ত্রী আমাকে পছন্দ করছে না, আমার সঙ্গে থাকতে তার আতঙ্ক, হ্যাঁ আতঙ্কই তো, —কাকু, মা, স্কুলের চাকরি এ-সব প্রশ্ন এদিকে উঠেছিলো, কিন্তু তার আগে ? সেই প্রথম যাত্রায় কলকাতায় থেকে যাবার প্রস্তাব দিতে মেয়েটির (স্ত্রী বলতে আমার ঘৃণা হয় এখন) চোখের তারায় যে আতঙ্ক ফুটে উঠেছিলো পুরুষ হ'য়ে আমি তা ধরতে পেরেছিলাম বৈকি।

আর ধরতে পেরে আমি তা বিশ্বের কাছে লুকিয়েছিলাম। কিন্তু মানুষ ক'দিন এই যন্ত্রণা সহ্য করতে পারে। একটা জায়গা চায় সে, একটি পাত্র খোঁজে। একজনের নিষ্ঠুর হওয়ার কাহিনী নিষ্ঠুরের মতো কাউকে ব'লে তারপর তার কাছে সৎ-পরামর্শের জন্য হাত পাততে না পারা পর্যন্ত সে শান্তি পায় না। সেই শান্তি আমি স্থবিনয়কে দিয়ে পেয়েছিলাম। অবশ্য খুব যে একটা বড়ো রকমের পরামর্শ ও আমাকে দিতে পেরেছে তা নয়। ওযেট্ অ্যাণ্ড সী ব'লে আমায় সান্ত্বনা দেওয়া ছাড়া নিরীহ মানুষটার মাথায় আর বিশেষ কিছু আসেনি।

না, ভুল বললাম, এসেছিলো, এসেছে। ও যে সত্যি আমার বন্ধু, আমার দুঃখে খুব বেশি বিচলিত হ'য়ে পড়েছে সেটা স্থবিনয় নিজে যতটা না বুঝেছিলো আমি বুঝেছিলাম ঢের বেশি।

স্থবিনয় আমার কপালে হাত রেখে জ্বর পরীক্ষা করলো। আমি বললাম, 'জ্বর নেই, কাল একটু গা গরম হয়েছিলো, আজ ভালো আছি।'

'তা তুই কী ঠিক করলি ?'

কথার উত্তর না দিয়ে আমি অন্য দিকে তাকিয়ে চুপ ক'রে ছিলাম। সুবিনয় আবার প্রশ্ন করলো, 'কী খেলি ?'

অল্প হাসলাম। হেসে সুবিনয়ের দিকে চোখ ফিরিয়ে বললাম, 'একটু বার্লি জ্বাল দিয়ে খেয়েছি। স্টোভ ধরাতে গিয়ে আঙুলটাও পুড়িয়েছি।'

'বেশ করেছিস।'

আমার মুখের দিকে তাকালো না সে। ঘরের মেঝেয় একরাশ ছেঁড়া ন্যাকড়া, অনেকগুলো পোড়া দেশলাইয়ের কাঠি, স্পিরিটের শিশি ও হাতল-ভাঙা একটা সস্‌প্যানের পাশে স্টোভটার দিকে চেয়ে থেকে সুবিনয় যেন কী চিন্তা করছিলো।

'আজ শনিবার ?'

'হ্যাঁ, অফিস থেকে বেরিয়ে সোজা তোর কাছে চ'লে এলাম। আজও সকালবেলা তোর বউদির সঙ্গে কথা হচ্ছিলো।'

আমি চুপ ক'রে আবার দেয়াল দেখছিলাম।

'তা হাত-পা পুড়িয়ে রেঁধে খেয়ে ক'দিন চলবে, না-হয় মেসে চ'লে যা।'

বললাম, 'তোমার ওয়েট্‌ অ্যাণ্ড সী উপদেশ মেনে নিয়ে এখানে প'ড়ে আছি আর-কি। যদি আবার কোনোদিন সে আসে।' হাসলাম।

'নন্‌সেন্স।'

নিরীহ সুবিনয়ের চেহারা চাপা ক্রোধে থমথম করছিলো দেখে হাসি বন্ধ করলাম।

'মেসে ফিরে যা, না-হয় আমি যা বলছি তা কর। এ-ভাবে থেকে শরীরটাকে শেষ করিস না।' সুবিনয়ও দেয়ালের দিকে চোখ রেখে কথা বলছিলো।

বিয়ের পর রেবা যে-বার প্রথম যাত্রা কলকাতায় আসে, মেস ছেড়ে দিয়ে নেবুতলায় একুশ টাকা ভাড়ার ছোটো একটা কামরায় বাসা বেঁধেছিলাম। সেই ঘরে আমি আজও প'ড়ে আছি। রেবা ফিরে আসবে ব'লে না, রেবার বার-বার এসে ফিরে যাওয়ার পরও যখন দেখলাম ফুড্ আর লজ্ বাবদ মাস যেতে পঁয়তাল্লিশ টাকা মেসে না দিয়ে এখানে একুশ আর একটু কম-সম খেয়ে এবং মাঝে-মাঝে রাত্রে মুড়িটুড়ি চালিয়ে আমি পঁয়ত্রিশের মধ্যে মোটামুটি সারতে পারছি, তখন ভাবলাম (আপনি যদি স্বল্প বেতনভোগী কেরানী হন, আপনিও এই রাস্তা ধরবেন), আর মেসে ফিরে যাওযার প্রশ্ন কেন। তা ছাড়া, তা ছাড়া আরো কথা আছে। সেদিন বিয়ে করেছি অথচ আজ সাত মাসের মধ্যেও আমার নামে সবুজ বা শাদা একটাও খাম আসছে না, মেসের লোকের চোখে সেটা বিসদৃশ ঠেকবে ভেবেও সেখানে ফিরে যেতে উৎসাহ পাচ্ছিলাম না। বলবেন আপিসের ঠিকানায বউ চিঠি দেয় ব'লে ওদের বোঝাবো। সেই রাস্তা বন্ধ ছিলো, কেননা মেসের তারাপদ রায় ও নগেন দত্ত নামে দুই ভদ্রলোকও আমার আপিসে চাকরি করে। এক-ঘরে, হ্যাঁ, এক টেবিলে ব'সে আমরা লেজার লিখি। কাজেই বুঝতে পারছেন লোকের কাছে কি লুকোতে আমার লোকালয়ে থাকতে সাহস হচ্ছিলো না। এই ঘরটাকে নির্জনাবাসই বলা যায়। গোটা বাড়ি থেকে বিচ্ছিন্ন টালি-ছাওয়া একতলা কামরা। আমার কাছে চিঠি আসে কি না আসে বাড়ির মালিক হার্ডওয়্যার মার্চেন্ট ধনপতি নন্দী কি তার গোষ্ঠীর কেউ উঁকি দিযে দেখতে আসবে না। তা ছাড়া আমার জ্বর হ'লো কি পেটের অসুখ, হাত পুড়িয়ে সাগু পাক ক'রে খেলাম কি পা পুড়িযে চালে-ডালে একত্র সিদ্ধ ক'রে খিচুড়ি, তা-ও তাদের জানতে মাথা ব্যথা নেই। দু-তিনবার বউ এসে গেছে, এখন দু-তিন বছর কেন, বাকি সারা জীবনেও যদি আর

সে কাছে না আসে, বাতব্যাধিতে আক্রান্ত হ'য়ে বারাণসীধামে স্বজনের কাছে প'ড়ে আছে আমার বলতে বাধা ছিলো না। আমি ব্যাচেলার নই, বিবাহিত, এটা যখন প্রমাণ হ'য়ে গেছে বাড়িওলার ঘর অধিকার ক'রে থাকতে আর ভয় ছিলো না। তা ছাড়া কেরানীরা সুযোগ পেলেই পরিবার দেশে পাঠিয়ে দেয় লক্ষপতি ধনপতি নন্দীরা সেটা জানেন না আমি বিশ্বাস করতাম না।

ঘরে না থাকলে তো কথাই নেই, থাকলেও অধিকাংশ সময় আমি দরজা-জানলা বন্ধ ক'রে রাখি। আর তা ছাড়া মাত্র দুটো জানলার মধ্যে বলতে গেলে দেড়খানাই ঘরের ওপাশে ধনপতিবাবুর কয়েক শ' টন পুরোনো জং-ধরা লোহার টুকরো স্তূপ ক'রে রাখা হয়েছিলো ব'লে খোলা সম্ভব হ'তো না। সুতরাং বাকি আধখানা দিয়ে বাইরের আলো বাতাস এবং মনুষ্যদৃষ্টি প্রবেশ করার তেমন সুযোগ ছিলো না। কাজেই আমি অধিকতর নিশ্চিন্ত ছিলাম। নির্জনবাস বৈকি।

কিন্তু এখানে এভাবে হাত পা ছড়িয়ে একলা শুয়ে-শুয়ে আমি দীর্ঘশ্বাস ফেলবো আর অনাহারে অর্ধাহারে থেকে শরীর নষ্ট করবো দেখতে সুবিনয় প্রস্তুত না। এখানে আমাকে ওয়েট অ্যাণ্ড সী নীতি মেনে চলতে দিতে সে নারাজ। বিশেষ ক'রে গত মঙ্গলবার আমাশয়ে ভুগে উঠে আবার এই বিষ্যুতবারেই সর্দিজ্বরে বিছানা নিয়েছি দেখে সুবিনয় আমার ওপর রীতিমতো খেপে গেছে এবং অগত্যা যদি আমি মেসে ফিরে না যাই তো আজ এখুনি আমাকে তার সঙ্গে তার বাসায় চ'লে যেতে হবে। 'কালও তোর বউদির সঙ্গে এই নিয়ে কথা হয়েছে।'

দেয়ালে পেরেকের গায়ে রেবার ফেলে-যাওয়া একটা রিবন ঝুলছিলো। অনেকদিন এক জায়গায় একভাবে থেকে কালি-ঝুল ও ধুলো লেগে চকচকে ফিতেটার ধূসর রং ধরেছে। ওটাকে অবলম্বন ক'রে এতবড়ো

একটা মাকড়সার জাল তৈরি হয়েছে। একটু-সময় সেদিকে তাকিয়ে থেকে পরে বন্ধুর চোখে চোখ রেখে বললাম, 'আমার লজ্জা করে।'

'তুমি স্ত্রীলোক।' সুবিনয় রীতিমতো ধমক লাগালো, 'লজ্জা করে! আমার সঙ্গে থাকবি, বন্ধুর বাসায় থাকবি এতে লজ্জাটা আসে কোথা থেকে আমায় বুঝিয়ে বলতে পারিস ?'

গত পরশু সুবিনয় প্রথম আমাকে এ-প্রস্তাব দেয়। এবং সেদিন যে-প্রশ্ন করেছিলাম আজ আবার সেই প্রশ্ন আমার চোখে ভেসে উঠলো।

সুবিনয় আমার হাতে হাত রেখে বললো, 'অরুণাকে সে-সব আমি কিছুই বলিনি। বিশ্বাস কর। তুই আমার বন্ধু। আমার কাছে তুই সব বলতে পারিস, কিন্তু তোদের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে এরকম একটা সম্পর্ক হ'য়ে আছে আমি মূর্খ না যে আমার স্ত্রীকে তা বলতে যাবো।'

আমি চুপ ক'রে রইলাম।

'বলেছি ওয়াইফ আসতে এখন কিছুকাল দেরি হবে, সেখানে আর-একটা পরীক্ষা পাস দিতে তাঁকে থেকে যেতে হচ্ছে, কাজেই সুধাংশু বাসা তুলে দেবে, এদিকে আবার মেসের খাওয়া তার সহ্য হয় না—ডিসপেপ্‌শিয়ায় ভোগে।'

'তোর তো একখানা মোটে কামরা, কি ক'রে হবে ?'

'হ্যাঁ, একখানা বটে, ওটাকেই পার্টিশন লাগিয়ে দুটো করা হয়েছে। দু-তিন মাস আমার পিসতুতো-ভাই বঙ্কিম তার স্ত্রী ও একটা বাচ্চা নিয়ে থেকে গেলো কিনা। খুবসম্ভব বঙ্কিমের ক্যানসার হয়েছে। চিকিৎসা করাতে কলকাতায় এসেছিলো।'

'তারা এখন কোথায় ?'

'চ'লে গেছে। বঙ্কিম আসামের কোন একটা চা-বাগানে চাকরি করে। খুবসম্ভব সেখানেই ফিরে গেছে। আর যাবে কোথায়। এ-রোগ তো সারবার নয়, মাঝখান থেকে এসে আমার কিছু—'

সুবিনয় থামলো।

'টাকা-পয়সা কিছু দেয়নি বুঝি ?'

'কোথা থেকে দেবে, দিয়েছিলো গোড়ার দিকে সামান্য, তারপর ডাক্তারে ওষুধে এমন খরচ হ'তে লাগলো যে এদিকে দুটো লোকের ভাতের খরচ বাচ্চার দুধের খরচ বলতে গেলে সবই প্রায় আমাকে—'

'এ-সব কথা কিন্তু তুই আমায় কিছুই বলিসনি।'

'কী আর হ'তো ব'লে। দুটো মাস আমার যা গেছে, আর্থিক তো বটেই, শারীরিক কষ্ট কি আর কম হয়েছে। আপিস বাজার, তার ওপর বঙ্কিমের জন্যে রোজ ডাক্তারখানায় ছুটোছুটি, একলা হাতে সব ম্যানেজ করা কি চাট্টিখানি কথা।'

'তা তো বটেই।' সুবিনয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে লক্ষ্য করলাম সত্যি এই দু-মাসে সে বেশ একটু রোগা হ'য়ে গেছে। 'যাক, চ'লে গেছে ওরা তোর দিক থেকে ভালোই হয়েছে।' আস্তে-আস্তে বললাম, 'পরের উপকার করা কি আর কারো অনিচ্ছা, কিন্তু আমরা পারি কোথায়, আমাদের মতো অবস্থার লোকের নিজেদের বাঁচিয়ে রাখাই যেখানে প্রায় অসম্ভব হ'য়ে দাঁড়িয়েছে, সত্যি কিনা ?'

তৎক্ষণাৎ কথা বললো না সুবিনয়। রেবার ফেলে-যাওয়া মলিন রিবনটা সে দেখছিলো।

আমি হাত বাড়িয়ে শিয়রের কুঁজো থেকে জল গড়িয়ে নিয়ে জল খেলাম।

'লোকের উপকার ছেড়ে দিয়ে তুই আমার উপকার কর। বিছানাটা

গুটিয়ে নে, স্যুটকেসটা গুছিয়ে রাখ, জলটা ধরুক, আমি একটা রিক্সা ডেকে নিয়ে আসছি।'

আমি ফ্যালফ্যাল ক'রে সুবিনয়ের মুখ দেখি।

'রিয়্যালি, মিথ্যে বলছি না, তুই গেলে, এক সঙ্গে আমার কাছে থাকলে আমার মস্ত উপকার হয়। কি চাকরি করি ক'টাকা মাইনে পাই তোর অজানা নেই। তিন-তিনটে বাচ্চা। এদিকে অগ্নিমূল্য হ'য়ে আছে সব জিনিসপত্তর। বাড়িভাড়া আছে, তার ওপর অসুখবিসুখে—'

যেন কি বলতে চেয়েছিলাম, সুবিনয় আমার মুখের ওপর হাত রেখে বাধা দিলে।

'চলতি কথায় আমি যদি বলি আমাব পেয়িং গেস্ট্ হ'য়ে তুই থাকবি তো তোর আপত্তি করা অন্যায়। আমারটা খাবি ব'লে তুই সেখানে যাচ্ছিস না। কেমন, হ'লো?'

আমার আর-কিছু বলার রইলো না। দুই হাতে চোখ ঢেকে চুপ ক'রে ভাবি। বাইরে বৃষ্টির শব্দ হচ্ছিলো। আমি জানি, আমি জানতাম, সুবিনয় আমাকে ধনপতি নন্দীর এই অন্ধকার গহ্বর থেকে উদ্ধার ক'রে নিয়ে যেতে আজ বদ্ধপরিকর হ'য়ে এসেছে। তাই শেষ অস্ত্র প্রয়োগ করলো। ওর সংসারে থাকা-খাওয়া বাবদ মাস-অন্তে কিছু টাকা হাতে তুলে দিলে আব-পাঁচটা খরচপত্রের দিক থেকে সুবিধা হবে চিন্তা ক'রে যে সুবিনয় আমাকে নিয়ে যেতে আসেনি এ-সম্পর্কে আমি নিশ্চিন্ত ছিলাম। আমার চেয়ে সুবিনয়কে কে-ই বা বেশি জানতো। দূর-সম্পর্কিত রুগ্ন পিসতুতো-ভাই স্ত্রী-পুত্র নিয়ে এই যে দু-মাস তার বাসায় থেকে খেয়ে চিকিৎসা করিয়ে গেলো, কই একদিনও তো সুবিনয়ের মুখ দিয়ে সে-কথা বেরোযনি। আসলে এই নির্জনবাস আশ্রয় ক'রে রেবার চিন্তায় রুগ্ন হ'য়ে-হ'য়ে আমি আয়ু ক্ষয় করছি, বন্ধু তো বটেই, আমার পরমাত্মীয় সুবিনয়ের

তা সহ্য হচ্ছিলো না। আমি জানি, আমি জানতাম, এই আস্তানার মোহ না ছাড়লে গোবেচারা নিরীহ স্থবিনয় দরকার হ'লে নিষ্ঠুর হবে, বলপ্রয়োগ করবে আমাকে এখান থেকে নড়াতে। কিন্তু তা না ক'রে আজ সে অন্য পন্থা অবলম্বন করলো।

'তিনটে লোকের সঙ্গে একটা লোকের খাওয়া যেমন ক'রে হোক চ'লে যায়, বিশেষ গায়ে লাগে না। আমি ঠিক করেছি, তুই যদি যাস তোর প্রথম মাসের টাকাটা দিয়ে তোর বউদিব একটা চশমা কিনে ফেলবো। কবে চোখ দেখানো হ'যে আছে কিন্তু টাকাব অভাবে আজপর্যন্ত ওটা কেনা হচ্ছে না, কিছুতেই ম্যানেজ করা যাচ্ছে না।'

'থাক, অত কথায় কাজ নেই।' রুষ্ট হ'তে গিয়েও হেসে উঠলাম। 'পেয়িং গেস্ট্ হ'য়ে তোর বাসায় থাকবো। কিন্তু মনে বেখো ব্রাদার, আমিও গরিব কেবানী। নিযমমতো যদি টাকা-পয়সা দিতে না পারি, এক-আধ মাস আটকে যায়, বউদি যেন শেষ পর্যন্ত আমায় না আবার উপোস রাখতে আরম্ভ কবেন।'

স্থবিনয়ও হাসলো।

'হুঁ, উপোস ঠিক বাখবে না। চালাক মেয়ে। দেনার কথা মনে করিয়ে দিতে থালায় ভাতেব সঙ্গে এক টুকরো কয়লা দেবে।'

আমি শব্দ ক'রে হেসে উঠলাম।

স্থবিনয় বললো, 'চল, আর দেরি ক'রে লাভ নেই, বৃষ্টিটা ধরলো বুঝি এবার।'

দর্জিপাড়ায় এক গলিব ভিতর স্থবিনয়েব বাসা। তা বাসা যত ছোটো হোক আর সাড়ে তিন হাত ও সাড়ে তিন হাত বন্দোবস্ত রেখে একটা টিনের পার্টিশন লাগিয়ে দুটো কামরা তৈরি করার চেষ্টা করতে গিয়ে

সুবিনয় ঘরখানাকে যতই শ্বাসরোধী ও অন্ধকার ক'রে তুলুক আমার তো মনে হয় ওখানে উঠে এক সন্ধ্যার মধ্যে শরীর মন ঝরঝরে হ'য়ে গেলো।

সন্ধ্যার পরেও বৃষ্টি পড়ছিলো।

এক ফাঁকে গিয়ে সুবিনয় বাজার ক'রে নিয়ে আসে।

আমি ভাত খাবো শুনে সুবিনয়ের বাজার করার প্রয়োজন হয়। বুঝলাম।

ওরা ধ'রে রেখেছিলো শরীর খারাপ আমার, রাত্রে সাগু আর রুটি খাবো।

অরুণা বললো, 'না হ'লে আমরা রাত্রে চা-মুড়ি দিয়ে কাজ সারতাম।' কথা শেষ ক'রে বউদি যখন সুবিনয়ের দিকে তাকিয়ে ঠোঁট টিপে হাসলো সুবিনয় তখন আমার সামনেই স্ত্রীকে ধমক দিলো। 'এত কথা বলতে তোমায় কে ডেকেছে। যদি চা হ'য়ে থাকে চা ক'রে নিয়ে এসো আগে।'

সুবিনয় রুষ্টভাবে কথাগুলি বলছিলো ব'লে তার হাতে একটা চাপ দিলাম। হাত সরিয়ে নিয়ে সুবিনয় বললো, 'না, না, মেয়েদের বেশি কথা বলতে দেখলে আমার গা জ্ব'লে যায়। তুই জানিস না।'

আমার চোখে বন্ধুকে হঠাৎ অন্যরকম ঠেকলো। কিন্তু, তখনই চিন্তা ক'রে দেখলাম, না, আমারই ভুল। ইতিপূর্বে স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলতে সুবিনয়কে দেখলেও রান্নাবান্না কি খাওয়া পরা নিয়ে দু-জনের আলোচনা আর শুনিনি। আগে এত কাছাকাছি আসিনি এদের আমি, অন্তঃপুরে।

'যাও জল ফুটেছে। চট্ ক'রে চা ক'রে নিয়ে এসো। তোমার চায়ে কি একটু আদা দেবে হে সুধাংশু?' মন্থরভাবে সুবিনয় আমাকে প্রশ্ন করলো। আমি মাথা নাড়লাম।

অরুণা আমাদের সামনে থেকে স'রে যাওয়ার পর সুবিনয় বললো, 'স্ত্রীকে চাপে রাখতে হয়। আমি স্ত্রী-শাসনের পক্ষপাতী।'

আমি কথা বললাম না।

তাকিয়ে দেখছিলাম নতুন জায়গা। আমি পায়খানা সেরে হাতমুখ ধুয়ে ঘরে ফিরে এসে দেখি আমার বিছানার বাণ্ডিল খোলা হয়েছে। স্থবিনয় কিছুই করছিলো না। কেবল দাঁড়িয়ে থেকে কাজের তদারক করছিলো। স্থবিনয়ের বড়ো মেয়েটা বছর সাত-আট বয়েস, মাকে সাহায্য করছিলো। আমার লাল স্থজ্‌নি বিছানো হ'লো। ময়লা বালিশ। বস্তুত বাদলার জন্যে ধোয়ানো যাচ্ছিলো না। তা ছাড়া ওয়াড়টা অনেকদিন থেকেই ময়লা হ'য়ে ছিলো। অরুণা যখন স্থজ্‌নির ওপর আমার বালিশ জোড়া বিছিয়ে পরে বালিশ দুটো আবার সরিয়ে নিচ্ছিলো স্থবিনয় তখন আচমকা ধমক দিয়ে উঠলো।

'আবার সরাচ্ছো কেন?'

'ওয়াড় দুটো খুলে ফেলবো।'

আমি লক্ষ্য করলাম কথা বলতে গিয়ে একবারও অরুণা স্বামীর দিকে তাকাচ্ছিলো না। রক্তাভ গাল।

পর-পর দু-তিনটে ধমক খেয়ে অত্যন্ত অভিমান হয়েছে বুঝতে পেরে আমি চোখ ফিরিয়ে দরজার বাইরে প্যাসেজের একটা বাল্‌বের অন্তিমদশায় চ'লে যাওয়া ধুকধুকে লালচে রেখা দুটো মনোযোগ দিয়ে দেখি।

'একটা কথা জিগ্যেস ক'রে তারপর কাজ করবে। ওয়াড় যে খুলছো এখন, বালিশে পরাবে কি? এতকাল ছিলো, আজ রাতটা থাকলে মহাভারত অশুদ্ধ হ'তো না।'

অরুণা যত না লজ্জা পেলো আমি লজ্জিত হলাম ঢের বেশি।

'আপনি ওটা আজ খুলবেন না।' বলতে অরুণা এই সরাসরি আমার মুখের দিকে তাকায়।

এবার লক্ষ্য করলাম রেবার চেয়ে সুন্দরী না হ'লেও অরুণা মন্দ-না। মন্দ-না বললে ছোটো ক'রে বলা হয়। হয়তো বেশি সুন্দরী। সত্যিকারের বুদ্ধিদীপ্ত চেহারার স্ত্রীলোক বলা যায়। শরীরে, চলাফেরায়, কথায়। বলতে কি, অরুণা ম্যাট্রিকও পাস করতে পারেনি, যদি না আগে কোনো-দিন সুবিনয় আমাকে জানিয়ে রাখতো আজ আমি ভাবতাম এই মেয়ে ডবল এম. এ। এত কাছাকাছি হ'য়ে আমি কোনোদিন মুখ দেখিনি। ভাবছিলাম রাগারাগি হবে। পুনঃপুনঃ আঘাত করার ফলে চোখে জল আসবে। কিন্তু তা এলো না।

অরুণা মুখ তুলে আশ্চর্য শান্তভাবে হাসলো। 'স্ত্রীর ওপর উঠতে-বসতে রাগারাগি করলে আজকাল স্ত্রীরা কি করে একবার ওঁকে ব'লে দিন তো ঠাকুরপো।'

'হ্যাঁ, আত্মহত্যা করে, পালিয়ে যায়— কোর্টে যায় মামলা করতে ডাইভোর্সের। তুই বুঝিয়ে ব'লে দে না সুধাংশু। আমার কথায় তো এর বিশ্বাস নেই।'

আমি একদিকের দেয়ালে চোখ রাখলাম। পরে চোখ ফিরিয়ে দেখলাম এক কথায় স্ত্রীকে থামিয়ে দিয়ে সুবিনয় নীরব নতনেত্র হ'য়ে তার কাজের তদারক করছিলো। 'পারিবারিক জীবনে তুই নিষ্ঠুর।' কেন জানি যতবার রূঢ়ভাবে স্ত্রীকে আদেশ-প্রত্যাদেশ করছিলো বার-বার সুবিনয়ের চোখে চোখ পড়তে আমার গলা বড়ো ক'রে বলতে ইচ্ছা হয়েছিলো, 'সংযত স্থিরবুদ্ধির মেয়ে বউদি, তা না হ'লে তোকে ঘোল খাইয়ে ছাড়তো।'

কিন্তু বললাম না।

মূর্খ রেবা আমার সেই মুখ হয়তো বাকি জীবনের জন্যে বন্ধ ক'রে গেছে। ভেবে ছোট্টো একটা নিশ্বাস ফেললাম।

রান্নাবান্না হ'লো। খাওয়া-দাওয়া শেষ।

বৃষ্টিটা আবার চেপে এসেছিলো।

এতক্ষণ আমাদের সঙ্গে, হ্যাঁ বিশেষ ক'রে আমার সঙ্গে থেকে 'কাকু' 'কাকু' ক'রে বড়ো আর মেজো ছেলেটা ঘুমিয়ে পড়েছে। তাই সুবিনয়ের বাসাটা হঠাৎ নীরব হয়েছিলো। বৃষ্টিতে আবার এখন মুখর হ'য়ে উঠলো।

নতুন লোক আসাতে খাওয়ার পাট চুকবার পরও অতিরিক্ত দুটো বাসনমাজা এবং এটা-ওটা ধোয়ামোছা সারতে বেশ রাত হ'য়ে গেলো।

আমার বিছানার ওপর শুয়ে এতক্ষণ পর মোটামুটি সব দিক থেকে নিশ্চিন্ত হ'তে পেরে যেন সুবিনয় আবার সুবিনয় হ'য়ে গেলো। অর্থাৎ আগের মতো হালকা মনে রেবা-সম্পর্কে আমাকে উপদেশ দিয়ে চললো। 'থাক এখন এখানে ক'মাস। চিঠিপত্র যখন দেয় না তুইও দিবি না। কোথায় আছিস ঠিকানা জানাবি না। আসবে না মানে? আলবৎ আসবে। ওয়েট অ্যাণ্ড সী। এক-আধটা বাচ্চা পেটে আসুক। বিদ্যার দাপট, নিজে চাকরি ক'রে তোর মতোন কি কিছু বেশি রোজগার করতে পারার ভ্যানিটি চুরমার হ'য়ে যাবে। বুঝলি, ও-সব থাকে না। আফ্‌টার অল্‌ শী ইজ এ উয়োম্যান। তার যা ধর্ম তাই পালন করতে এসেছে সে পৃথিবীতে। যতক্ষণ না পাচ্ছে, যতক্ষণে না সেই সাধ পূরণ হচ্ছে ততক্ষণ তুমি নিজের স্ত্রীর ক্যারেক্টার বিচার করতে পারছো না।'

আমি কথা বলছি না।

বৃষ্টিটা আবার থেমেছে। শেষ বর্ষার বৃষ্টি যায় আসে, আসে যায়।

যেন কোথায় একটু টিনের ছাদ ছিলো সুবিনয়ের বাসায়। বর্ষণ থামতে কোথা থেকে ফোঁটা-ফোঁটা জল প'ড়ে একটা ঢপঢপ আওয়াজ হচ্ছিলো।

'বুঝলি, বিয়েটা কিছু না। ওটা স্বামী-স্ত্রীর জীবনে একটা বন্ধনই নয়। পরিণয়ের আসল সুতো হ'লো সন্তান। একটা বেবি হোক তখন দেখবি।'

এবার সুবিনয় আর আস্তে কথা বলছিলো না। আমার মনে হ'লো যেন ভিতরে চৌবাচ্চার ধারে অরুণা ধোয়া-মাজার কাজ করছিলো। কথাগুলি সে-ও শুনছে কিনা চিন্তা করছিলাম।

'চুপ ক'রে আছিস কেন?' হেসে সুবিনয় আমার পেটে আঙুলের গুঁতো দিলো। বললাম, 'শুনছি, তুই ব'লে যা।'

'সুতরাং টেক্ অ্যানাদার চান্স্। আবার আসুক। এর আগে চান্স্ নিয়েছিলি?'

আমার কান লাল হ'য়ে উঠলো। কেননা, সুবিনয় আরো জোরে কথাটা বললো। যেন মনে হ'লো বাসন ধোয়া সেরে অরুণা ঘরে ফিরেছে। পার্টিশনের ওপারে চুড়ির শব্দটা কানে লাগলো।

'হাঁ-ক'রে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখছিস কি, উত্তর দে।'

আমার গলা শুকিয়ে যায়। যেন তিন দিন পর ভাত পথ্য ক'রে হঠাৎ অসময়ে এমন পিপাসা পেলো। চেপে গেলাম। কেননা, তখন যদি আমি হেসেও জলের কথা বলতাম সুবিনয় অট্টহাস্য ক'রে উঠতো। আজ আপনাদের কাছে বলছি, সেদিন, তখন আমাদের সংক্ষিপ্ত দাম্পত্য-জীবনের সব কথা সুবিনয়ের কাছে প্রকাশ করার পরও একটা জিনিস গোপন করলাম। নিষ্ঠুরা রেবা মা হবার সুযোগ প্রতিবার কৌশলে এড়িয়ে গেছে যদি আমি বন্ধুকে বলতাম, ঘরের সিলিং কাঁপিয়ে সে হেসে উঠতো নয়তো ক্রুদ্ধ কণ্ঠে আমার পৌরুষকে ধিক্কার দিয়ে বলতো, 'ফুল্—তুই একটা গর্দভ। যা এখন ভেরেণ্ডা ভাজগে—' ইত্যাদি।

আমি দু-বার ঘাড় নাড়লাম। অর্থাৎ আগেও চান্স্ নিয়েছি এবং

ভবিষ্যতে কোনোদিন রেবা এলে ওকে মাতৃত্বের গৌরব দিতে চেষ্টা করবো। আমার বুকের ভিতর হুহু করছিলো।

যথার্থ উত্তর পেয়ে নিশ্চিন্ত হ'য়ে সুবিনয় গলা খাটো করলো এবার। মুখ দিয়ে একটা গুজ্‌গুজ্‌ শব্দ বের ক'রে হেসে বললো, 'আমি ওভার-লোডেড হ'য়ে গেছি যদিও। তিনটে। আর-একটি আসছে। খরচটা বাড়ছে সত্যি, কিন্তু এক জায়গায় স্যাটিসফ্যাকশন আছে।'

সুবিনয়ের মুখের দিকে তাকাই।

'তা তো বটেই, এতগুলি সন্তানের বাপ হয়েছিস।'

'কেবল কি তাই! তিনিও ভালো হাতে আটকা পড়েছেন। একবেলার জন্যে আর বাইরে পা বাড়াবার উপায় নেই।'

'কেন?' প্রশ্নটা ঠিক বুদ্ধিমানের মতো হ'লো না টের পেলাম যদিও।

সুবিনয় বললো, 'কে এমন বড়োলোক আত্মীয় আছে যে, এই দুর্দিনের বাজারে এতগুলি বাচ্চা সমেত গিয়ে উঠলে ভালো মনে তিন বেলা খেতে দেবে। কাকার পরিবার দেখতে বছরের পর বছর তোর স্ত্রী বেনারস প'ড়ে আছে। বাচ্চা-কাচ্চা হবার আগে আমার উনিও যেতেন সেওড়াফুলি এক মামীর সংসার দেখতে। সাত-আট দিন সেখানে কাটিয়ে আসতো অরুণা। এখন?' একটু থেমে সুবিনয় পরে হাসলো। 'যদি-বা কালেভদ্রে কোথাও থেকে নিমন্ত্রণ আসে, এখন যাওয়া হয় না আর-এক কারণে।' সুবিনয় টাকা বাজাবার মতোন দুই আঙুলের বাড়ি মেরে বললো, 'এত পয়সা পাবেন কোথায় যে, আণ্ডাবাচ্চা নিয়ে শ্রীমতী নায়ের করতে যাবেন। ট্র্যাম-বাসের খরচ আছে না? আমি বাবা স্রেফ ব'লে দিয়েছি, যাও, যেতে পারো, কিন্তু তারপর আর তিন দিন বাজার করা হবে না। কথাটি মনে রেখে বাড়ি থেকে পা বাড়িয়ো।' কথা শেষ ক'রে সুবিনয় টেনে-টেনে হাসলো।

মৃদু হেসে বললাম, 'শক্ত বাঁধনে বাঁধা পড়েছেন বউদি। একদিনের জন্যে আর চোখের আড়াল হবার উপায় নেই।'

যেন আত্মতৃপ্তিতে একটু-সময় চোখ বুজে চুপ ক'রে রইলো সুবিনয়। তারপর ঘাড় তুলে আমার কানের কাছে মুখ এনে বললো, 'তুই দেখে বুঝতে পারলি যে অরুণা আবার কন্‌সিভ করেছে?'

আমি মাথা নাড়লাম।

'তা আর কি ক'রে বুঝবি। অভিজ্ঞতা নেই যখন। রংটা আরো ফর্সা হয়েছে লক্ষ্য করেছিস? এ-সময় মেয়েরা দেখতে বেশি সুন্দর হয়। দাঁড়া, আর-একবার ডাকছি, আর-একবার ত্যাখ।'

প্রচণ্ড শব্দ ক'রে জোরে বৃষ্টি নামলো।

কিন্তু সেই শব্দ ডুবিয়ে দিয়ে চড়া স্বরে সুবিনয় হাঁকলো, 'অরুণা!'

'যাই।' ঠাণ্ডা মিষ্টি গলা পার্টিশনের ওপার থেকে ভেসে এলো।

'তোমার কি আর ওদিক সারা হবে না সারারাত।' নীরস কণ্ঠস্বর এপারে সুবিনয়ের। 'সেই কখন খাওয়া হয়েছে, চৌবাচ্চার কাজ সারা হ'লো?'

'হয়েছে।'

'এখন কি হচ্ছে। খুটখাট শব্দ?'

'বাচ্চাদের মশারি খাটাচ্ছি। দড়ির একটা পেরেক উঠে গেছে। বাড়ি মেরে বসাচ্ছি।'

'কী অদ্ভুত মানুষ, ওটা তো বিকেলেই বলা উচিত ছিলো আমাকে। রাত বারোটার সময় এখন—'

ওপারে কথা শোনা গেলো না।

'মশারি খাটিয়ে এখানে একবার এসো।'

বিরক্তিটা দূর হ'তে সুবিনয়ের সময় লাগলো একটু।

ওপাশে আর খটখট আওয়াজটা শুনলাম না।

'মনে হয় সারাক্ষণই তুই খিটিমিটি করিস বউ-এর সঙ্গে।' আস্তে বললাম, 'এখন টের পাচ্ছি।'

'তাতে কি আমার সংসার ফুটিফাটা হ'য়ে গেছে! এখানে এসে এই এক সন্ধ্যের মধ্যে ফাটল কোথাও চোখে পড়লো নাকি তোর?'

'না, না, তা হবে কেন।' কি ইঙ্গিত করতে চাইছে বুঝতে পেরে লজ্জায় ব্যস্ত হ'য়ে বললাম, 'তুই কেবল তাড়াহুড়োই করিস, কোনো কাজে সাহায্য করিস না। বউদি মাথা ঠাণ্ডা রেখে সব ধীরেসুস্থে করছে ব'লেই দিনকে-দিন এমন ফুলবাগানের মতো সুন্দর হচ্ছে সংসারটি তোমার। বাচ্চাগুলো ভালো থাকুক। দেখে আমার এত ভালো লাগছিলো তখন থেকে।' কথাগুলি বেশ জোরে-জোরে বললাম।

'না, তেমন ক'রে আর সাজাতে পারছি কই।' আত্মতৃপ্তিতে সুবিনয়ের চোখ আবার আধবোজা হ'য়ে এলো। 'ওই শালার টাকা-পয়সার অভাবটাই মাঝে-মাঝে মাথা গরম ক'রে দেয়। না হ'লে— না হ'লে—' চোখ দুটো সম্পূর্ণ বুজে যায় সুবিনয়ের এবং সে-অবস্থায় কিছুক্ষণ চুপ থেকে যেন কি একটু ভেবে পরে বলে, 'না হ'লে প্রথম থেকে— ফ্রম দি ভেরি বিগিনিং অব যাকে বলে দাম্পত্য-জীবন— কন্‌জুগ্যাল লাইফ, এ-পর্যন্ত মন্দ কাটিয়ে আসিনি আমরা। আমার তো মনে হয় আমি এবং সে— দু-জনেই সুখী।'

স্বামীর গালি খেয়েও বউদির সন্ধ্যা থেকে হাসি-হাসি ক'রে রাখা মুখখানা আমাকে এখন তাই মনে করিয়ে দিলে।

যেন ঈষৎ অপদস্থ হ'য়ে চুপ ক'রে গেলাম।

মিটিমিটি হেসে সুবিনয় বললো, 'লিভার সতেজ রাখতে নিত্য একটু তেতো খেতে হয়, জলে কোনো জার্ম না থাকে তাই ওতে একটু ফিটকিরি

মেশাতে হয়। সংসারেব ডিসিপ্লিন রাখতে তাই বকাঝকারও দরকার। বুঝলি ? গিন্নীকে যে-পুরুষ শাসন করে না আমি সেগুলোকে মেষ বলি। ওদের কপালে দুঃখ থাকে। হ্যাঁ, আদর করতে হবে বৈকি, কিন্তু তার একটা টাইম আছে, সেটা তিনি যখন গৃহস্থালীতে লাগেন তখন না। যখন তিনি অবসর, যখন শয্যাসঙ্গিনী হন তখন। তুই ম্যারেড্ ম্যান্, তোকে আর বোঝাবো কি। কিন্তু বহুপুরুষ, মানে বিবাহিত লোক তা বোঝে না— অর্থাৎ জানে না সংসার করতে হ'লে কিভাবে চলতে হয়। ফলে ভোগে।'

একটু চুপ থেকে সুবিনয় বললো, 'বলছিলাম বেতনের টাকা ফুরোলে মাসের শেষে মাথা গবম হয়, অশান্তি পাই। কিন্তু যখন চারদিকে তাকাই তখন ভাবি ও কিছু না, মন-গড়া দুঃখ। টাকাব কাঁড়ির ওপর ব'সে থেকেও কত শ্রীমানের বিবাহিত জীবন ব্যর্থ হ'য়ে যায়, কি বলিস।'

আমি সুবিনয়ের চোখের দিকে না তাকিয়ে মাথা নাড়লাম।

'কাজেই, ছেঁড়া পাঞ্জাবি গায়ে দিই আর পটি-লাগানো জুতো পায়ে থাকুক, আমি সুখী ; আমার সুখ দেখে অনেক টাকাওয়ালা ঈর্ষা কবেন। তুই চুপ ক'রে আছিস সুধাংশু।'

বললাম, 'এক শ' বার হাজার বার। কই, বউদিকে ডাক না। আমি একটু জল খাবো। তৃষ্ণা পেয়েছে।'

'কি হ'লো, শুনছো ?' এ-ঘর থেকে সুবিনয় আবার হাঁকলো, 'তোমার মশারি খাটানো হ'লো ? সুধাংশু জল খাবে।'

ওধারে কথা শোনা গেলো না।

পুরো একটা মিনিট কাটলো।

'বেশ মজা তো!' অসহিষ্ণু হ'য়ে সুবিনয় আমার বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো।

'তুমি কোথায়, ঘরে ?'

'না, বারান্দায়।' আর-একটু ভিতর থেকে এবার উত্তর এলো, 'বাবলু পেন্টুলনে তখন কাদা ভরিয়েছে, ধুয়ে দিচ্ছি, তা যেমন বাদলা, কাল শুকোবে কি।'

আমার চোখে চোখ রেখে সুবিনয় বললো, 'মেজো ছেলে আমার। তখন তো তুই দেখলি।'

ঘাড় নাড়লাম।

সুবিনয় আমার দিকে না তাকিয়ে আবার পার্টিশনের দিকে মুখ ফেরালো। 'তা বাবলুর পেন্টুলনে তো সেই কখন বিকেলে কাদা লেগেছিলো। এতসব জিনিসপত্র ধোয়াধুয়ি ক'রে এলে এক ঘণ্টা চৌবাচ্চার পাশে ব'সে। তখন ওটার কথা মনে ছিলো না, বড়ো-যে মশারি খাটিয়ে শুতে এসে এখন ছেলের পেন্টুলন নিয়ে ব'সে গেছো ?'

উত্তর নেই, কেবল ঝুপ-ঝুপ শব্দ শোনা গেলো। আর বন্ধুপত্নীর হাতের স্বল্প চুড়ির মৃদু রিন্‌রিন্‌। পেন্টুলন কাচা হচ্ছিলো।

আরো-একটা মিনিট কাটতে দিয়ে সুবিনয় আবার হাঁকে, 'তোমার হ'লো ?'

এবারও কথার উত্তর না দিয়ে বউদি কি যেন একটা জোরে আছড়ায়। বৃষ্টি একেবারে থেমে গেছে। তাই ওধারের সিমেন্টের ওপর চটাস্‌-চটাস্‌ আওয়াজ এধারের সিমেন্ট কাঁপিয়ে তুললো। যেন আর ধৈর্য রাখতে না পেরে সুবিনয় ছুটে যাচ্ছিলো। আমি হাত চেপে ধরলাম। 'এত অস্থির কেন। আসবে এখুনি। একটা পেন্টুলন ধুতে আর কত সময় লাগবে।'

আমার কথায় কান না দিয়ে ওপাশের শব্দ লক্ষ্য ক'রে সুবিনয় চিৎকার ক'রে বললো, 'আমি যদি আসি তো বাল্‌তির মধ্যে তোমার মুখ চেপে ধরবো, ডাকছি, বড়ো-যে সাড়া দিচ্ছো না ?'

'ভালোই হয় তবে, বিষ খেয়ে কি পালিয়ে গিয়ে তোমার যন্ত্রণা থেকে রেহাই পাবার আর দরকার পড়বে না আমার, বাল্‌তির সাবান-গোলা-জলের ভেতর একটু বেশি সময় মুখটা চেপে ধ'রে রেখো, অতি সহজে কাজ সারা হবে।'

যেমন আশা করছিলাম। ঠাণ্ডা মিঠে গলায় অরুণা কথা বলে আর হাসে আর কাপড় কাচে ঝুপ-ঝুপ। না, যেন কাচা হ'য়ে গেছে, এই বেলা বাল্‌তির জলে সেটা ধোয়া হচ্ছিলো।

'তা আজ সেটি পারবে না, বাড়িতে ঠাকুরপো আছেন। আমায় খুন করছো টের পেলে পুলিশ ডাকবেন।' যেন বারান্দা ছেড়ে অরুণা এখন ঘরে এসে ঢুকলো।

স্ত্রীর উক্তি শুনে সুবিনয় আমার দিকে ঘাড় ফিরিয়ে ঠোঁট টিপে হাসছিলো। কিন্তু আমি তা গ্রাহ্য না ক'রে পার্টিশনের দিকে মুখ রেখে বললাম, 'ঠিক বলেছেন বউদি। আমি এসেছি এখন সুবিনয় আর কিছু করতে পারবে না।'

'দেখুন, দেখে যান আপনার বন্ধু কেমন ক্রুয়েল। রাতদিন স্ত্রীর ওপর রাগারাগি আর বকাবকি। আপনি কালই রেবার কাছে চিঠি লিখে দিন।'

অট্টহাস্য ক'রে এ-ঘরের দেয়াল কাঁপিয়ে তুললো সুবিনয়। 'তাই দে, আজ রাতেই চিঠিটা লিখে রাখ সুধাংশু। আর লিখে দে, তোর বউ যখন আবার কলকাতায় আসবেন বেড়াতে-বেড়াতে একবার যেন দয়া ক'রে তোর বন্ধু সুবিনয়বাবুর এত নম্বর মসজিদবাড়ি স্ট্রীটে উঁকি দিয়ে দেখে যান। স্ত্রীলোক। এক-নজর দেখলেই বুঝবেন বিয়ের পরদিন থেকে যে-চারাগাছটাকে তার স্বামী উঠতে-বসতে গামলা আর বাল্‌তির জলে চুবিয়ে মারছে ফল ফুল কুঁড়ি পাতায় বর্ষার ডুমুর গাছটি হ'য়ে উঠেছে।' কথা শেষ ক'রে বন্ধু টেনে-টেনে হাসছিলো।

নিজের সংসারের সুখ বর্ণনা তো বটেই তার সঙ্গে আমার লক্ষ্মীছাড়া সংসারের দিকে একটুখানি উপেক্ষার ইঙ্গিত ছিলো টের পেয়ে চুপ ক'রে রইলাম।

বন্ধুপত্নী এক গ্লাস জল নিয়ে ঘরে এলো।

অরুণা হাসছিলো। তার কান বেয়ে চুল বেয়ে জল পড়ছিলো। বৃষ্টিতে বেশ ভেজা হয়েছে মাথা দেখে মনে হ'লো।

নোলকের মতো নাকের ডগায় একটা জলের ফোঁটার দিকে তাকিয়ে বললাম, 'জলটা মুছে ফেলুন।'

অরুণা বাঁ-হাত দিয়ে নাকের জল মুছে জলের গ্লাসটা আমার হাতে তুলে দিয়ে নীরবে হাসলো। হাসির সঙ্গে একটি মেয়ে-মন ভীষণভাবে আমার মনের মধ্যে উঁকি দিয়ে গেলো।

গ্লাসটা আমার হাত থেকে ফিরিয়ে নিয়ে এবং আমার ওয়াড়হীন বালিশ দুটোর ওপর ওর সবে-পাট-ভাঙা একখানা ধোয়া ধবধবে শাড়ি বিছিয়ে দিয়ে বললো, 'আর-কিছু দরকার হবে ঠাকুরপোর ?'

বললাম, 'না। ভীষণ কষ্ট দিলুম হঠাৎ এসে উঠে। এত রাত হ'য়ে গেলো কাজ শেষ হ'তে আপনার।'

'না, মোটেই না, একবার জিগ্যেস ক'রে দেখুন। আপনি না এলেও রোজ বারোটা বাজে। একলা হাত আমি সব দিক সামলাতে পারি না।'

'ও, তুমি তা হ'লে বলছো আমি আপিস থেকে খেটেখুটে এসে তোমার ছেলেমেয়ের পেণ্টুলন সাফ করি, বেশ মজা।'

সুবিনয় আমার চোখের দিকে তাকিয়ে বললো, 'আব্দার ছাখ সুধাংশু। এমন দুঃখের জীবন হবে জানতে পারলে কোন শালা বিয়ে করতো, তুই বল।'

'বেশ তো, রেবাদি আসুন একবার। দেখে যান কোন কাজটা

অপূর্ণ থাকে শেষ পর্যন্ত। বড়ো-যে অষ্টপ্রহর হৈ-রৈ করছো।' ব'লে অরুণা আমার দিকে তাকালো।

'রেবার আসবার দরকার কি, সুধাংশু এখানে উপস্থিত আছে। সে নিজে দেখুক। কতটুকুন-বা সংসার, কী বা থাকতে পারে কাজ যে একেবারে ওই নিয়ে মত্ত হ'য়ে আছো সারাক্ষণ। একটা লোক একলা হাতে একটা বড়ো দেশ ম্যানেজ করে, রাজ্য চালায়।'

আমি সুবিনয়ের যুক্তি শুনলাম না। একটু গম্ভীর হ'য়ে বললাম, 'ছেলেপুলের সংসারে কাজের ঝক্কি অনেক। মেয়েদের দারুণ কষ্ট হয়।'

'অ্যাঁ, তুই কত কষ্ট বুঝেছিস। যেন কত তোর অভিজ্ঞতা। আজ অবধি তো রেবা তোকে—'

কথাটা সুবিনয় শেষ করলো না। হোহো ক'রে হাসলো। আমার কান লাল হ'য়ে উঠলো। বুঝতে পারার মতো বুদ্ধিমতী অরুণা। তার দুই কানও লাল হ'য়ে গেছে লক্ষ্য করলাম।

আমার চোখে ধরা পড়বে ব'লে ভয় পেয়ে আমি ওর মুখের দিকে তাকাতে অরুণা হেসে উঠে তাড়াতাড়ি বললো, 'যারা রাতদিন স্ত্রীকে বকাবকি করে তারা কি প্রকৃতির পুরুষ জানেন নিশ্চয় ঠাকুরপো?'

অল্প হেসে বললাম, 'স্বার্থপর!'

অরুণা আড়চোখে সুবিনয়ের দিকে তাকিয়ে বললো, 'সে-সব পুরুষকে মেয়েরা ঘৃণা করে।'

হাত দিয়ে মাছি তাড়ানোর মতো প্রবল হেসে ঘৃণাটা উড়িয়ে দিয়ে সুবিনয় স্ত্রীর শরীরের ওপর চোখ রেখে বললো, 'কতটা ঘৃণা করো তার প্রমাণ দেখাতেই তো এসেছো মাঝ রাতে দু-জন পুরুষের সামনে। তা সুধাংশু পাকা ছেলে। আমি বলার আগেই ও টের পেয়েছে যে

আবার তুমি—' হিহি ক'রে হাসলো সুবিনয়। 'মেয়েরা পুরুষদের ঘৃণা করে!'

হাসতে-হাসতে বার-বার বলছিলো সে। অরুণা ছুটে পালালো।

হ্যাঁ, সেই রাত্রেই অদ্ভুত ঘটনাটা ঘটেছিলো। যার ওপর আমার এ-গল্প দাঁড়িয়ে। ওরা চ'লে যেতে আমি আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়লাম। বাইরে বৃষ্টি খরতর হ'য়ে উঠছিলো। নতুন জায়গা, কাজেই শুয়ে পড়ার সঙ্গে-সঙ্গেই ঘুম এলো না। জেগে চুপ ক'রে বৃষ্টির শব্দ শুনলাম। আর চিন্তা করলাম সুবিনয়ের কথা। বেচারা তখন এতটা প্রগল্‌ভ এতটা অসতর্ক হ'য়ে উঠেছিলো ব'লে দোষ দিতে পারিনি তাকে। এতকাল আমি আমার হারানো-স্ত্রীর গল্প ব'লে-ব'লে আর উপদেশ চেয়ে-চেয়ে বন্ধুকে হয়রান ক'রে তুলেছিলাম। আজ আমি তার অন্তঃপুরে এসে পা বাড়াতে সে তার একান্তভাবে পাওয়া স্ত্রীকে নিয়ে রাগারাগি অথবা হাসাহাসি ক'রে আমার কাছে নিজের দাম্পত্য-জীবনের অগাধ সুখ প্রমাণ করবার চেষ্টা করবে স্বাভাবিক।

না করাটাই সুবিনয়ের পক্ষে অস্বাভাবিক ঠেকতো। শুয়ে-শুয়ে সুবিনয়ের আস্ফালন ও তার স্ত্রীর বার-বার চমকে উঠে পরমুহূর্তে স্বাভাবিক হেসে আক্রমণ প্রতিরোধ করার সুন্দর ছবিটা চিন্তা করতে লাগলুম। আপনাদের কাছে অস্বীকার করবো না, কান পেতে রইলাম পার্টিশনের দিকে।

এক-আধটা কথা শোনা যেতে পারে আর সেই কৌতূহল নিয়ে আমি যদি কান পেতে থাকি তো আমার সেই রুচিকে আপনারা ক্ষমা করবেন না জানি। কিন্তু আমার তখন মনের অবস্থা কি ছিলো? খুব স্বাভাবিক যে, আমি জেগে থেকে রেবার চরিত্রের সঙ্গে অরুণাকে মিলিয়ে দেখবো

দুই নারীর রূপ। রেবা তেমন ক'রে কোনোদিন আমার সঙ্গে কথাই বলেনি। পাশের কামরায় বন্ধুপত্নী সুধাকণ্ঠী অরুণা, হ্যাঁ, বলতে গেলে রিক্সা থেকে নামার পর সেই বিকেল থেকে আমাকে আচ্ছন্ন ক'রে রেখেছিলো। আমি খাওয়ার পরে একবার ছাড়া অরুণার হাতে আগে আরো পাঁচ-সাত গ্লাস জল চেয়ে খেয়েছি। সুবিনয় বাজারে গেছে পর অরুণার সঙ্গে কত কোটি কথা বলেছি তার হিসাব দিতে পারবো না।

রাত্রে অন্ধকারে বিছানায় ঢোকার পরও যদি সুবিনয় স্ত্রীকে ধমক দেয় তো তার উত্তরে অরুণা না-জানি কেমন ক'রে কথা বলবে শুনতে ছেলেমানুষের মতো প্রায় পাগলের মতো কান খাড়া রেখেছিলাম। কিন্তু বাইরে প্রবল প্রখর বারিপাতের শব্দ আর এই ছোট্টো বাসায় পাশের কামরায় সুবিনয়ের সংসারের ঘুমন্ত ছোটো-বড়ো মানুষগুলোর লম্বা-লম্বা শ্বাস টানার শব্দ ছাড়া আর কোনো শব্দ ছিলো না। কান খাড়া রেখে বৃষ্টির শব্দকে উপেক্ষা ক'রে আমি অতঃপর ওদের দু-জনের, বন্ধু সুবিনয় ও তার স্ত্রী অরুণার শ্বাস-প্রশ্বাস বিচার করতে লাগলুম।

হয়তো সেই অবস্থায় আমার ঘুম এসেছিলো।

এক-সময় হঠাৎ চোখ মেলে টের পেলাম মাথাটা আর তুলে ধরা হাতের তেলোর ওপর রাখা নেই। বালিশে নেমে গেছে। মুখটাও পার্টিশনের দিকে ঘোরানো নেই। আমি যে-দেয়াল পিঠের দিকে রেখে শুয়েছিলাম সেই দেয়ালের দিকে মুখ ক'রে এখন অন্ধকারে ফ্যাল্‌ফ্যাল্‌ ক'রে তাকিয়ে আছি। বাইরে বৃষ্টির গর্জন থেমেছে। টিনের ওপর বৃষ্টির ফোঁটার ঢপঢপ শব্দটা আরম্ভ হয়েছে। কিন্তু থেমে-থেমে, একটানা নয়, যেন, যেখান থেকে জল পড়ছিলো সেখানে জল ক'মে এসেছে। বৃষ্টিটা তা হ'লে বেশ-কিছুক্ষণ ধরেছে অনুমান করলাম।

কিন্তু জলের শব্দ না অন্য কারণে আমি আবার কান পেতে থাকি। আমার মনে হ'লো একটা বেড়াল মিউ ক'রে উঠে আবার থেমে আছে। আমার যেন মনে হ'লো বেড়ালটা আমার নাক ও মুখের উপর তার ঈষদুষ্ণ কোমল মোলায়েম শরীরটা বার-দুই ঘ'ষে দিয়ে এইমাত্র জানলার বাইরে লাফিয়ে গেছে। শিয়রের ওপর একটা ছোট্টো জানলা এখন চোখে পড়ছে। একটা পাল্লা খোলা। এদিকে একটা জানলা আছে আগে আমার চোখে পড়েনি। গরাদের উপর এক-চিল্‌তে আলোর রেখা ধুকধুক করছে। দুই চোখ রগ্‌ড়ে আরো একটু-সময় সেদিকে তাকিয়ে তারপর অবশ্য বুঝতে কষ্ট হ'লো না, আলোর রেখা পাশের বাড়ির কোনো ফাঁক কি ফাটল দিয়ে বেরিয়ে এসে সুবিনয়ের ঘরের জানলায় উঁকি দিয়েছে। কিন্তু আমি চিন্তা করছিলাম পাল্লাটা কি ক'রে খুললো। ভাদ্র মাসের পচা রাত। ঘরের ভিতর এমন গুমোট। পায়রার খুপ্‌রির মতো সুবিনয়ের এই কামরায় একলা বিছানায় শুয়ে সেইজন্যই তখন আমার আরো ঘুম আসছিলো না এবং মনে-মনে আমি একটা জানলা কামনা করেছিলাম বৈকি। ছোটো হ'লেও ওই ফাক দিয়ে একটু-একটু হাওয়া আসছে টের পেলাম, হাওয়ায় বৃষ্টির গন্ধ ছিলো। বেড়ালটা এই জানলা দিয়ে ঢুকেছিলো এবং সম্ভবত আমার বিছানায় আশ্রয় নিতে চেয়েছিলো। আমি জেগে ওঠার সঙ্গে-সঙ্গে পালিয়েছে এখন বুঝতে কষ্ট হ'লো না। জানলায় হয়তো ছিটকিনি ছিলো না। হয়তো এক-আধটা দমকা বাতাস এসে থাকবে তাই একটা পাল্লা স'রে গেছে। দ্বিতীয় পাল্লাটাও হাত বাড়িয়ে খুলে দেবো কিনা চিন্তা করছিলাম, হঠাৎ গরাদের সেই ফিন্‌ফিনে আলোর রেখাটা যেন একটা বড়ো আলো হ'য়ে দপ্‌ ক'রে আমার চোখের সামনে জ্ব'লে উঠলো। খুব চমকে উঠলাম বৈকি। তারপর হাসলাম। 'বউদি, এত রাত্রে!' বিছানায় উঠে ব'সে

গলা বাড়িয়ে মুখটা আমি জানলার কাছে সরিয়ে নিই। স'রে এসে গরাদের সঙ্গে গাল ঠেকিয়ে অরুণা দাঁড়ায়।

'আপনি ঘুমোননি ?'

'না, তেমন ভালো ঘুম আসছে না।'

'নতুন জায়গা।' অরুণা ঠোঁট টিপে হাসলো। 'আমি টের পেয়েছি, আপনি বিছানায় ছটফট করছিলেন।'

আপনাদের বলেছি এমন বুদ্ধিদীপ্ত প্রতিভামণ্ডিত মোহিনী মুখ জীবনে আমি খুব বেশি দেখিনি। থুতনি ঠোঁট নাক কপাল ভুরু ঠোঁটের পিছনে সরু শাদা দাঁতের সারি চোয়ালের ধার লম্বা পালক ঘেরা চোখের বিদ্যুৎ মধ্যরাত্রে আমাকে, হ্যাঁ, রোমাঞ্চিত ক'রে তুলেছিলো। আমি সময়ের অতিরিক্ত সময় ওর মুখের দিকে তাকিয়ে নিস্পন্দ হ'য়ে রইলাম। গায়ে ব্লাউজ ছিলো না।

পরনে আধময়লা নরুন-পাড় ধুতি। শাড়িটা তখন ভিজে গেছে ব'লে ছাড়া হয়েছে বুঝতে কষ্ট হ'লো না। সুবিনয়ের কাপড় ওটা অনুমান করলাম।

হাঁ-ক'রে অরুণার চোখে চোখ রেখে, এই মেধাবী মেয়ের কাছে আমি ভীষণভাবে ধরা না প'ড়ে যাই তাই চট্ ক'রে বললাম, 'না, নতুন জায়গা ব'লে আমার বিশেষ তেমন অসুবিধা বোধ হয়নি। বেশ ঘুমিয়ে ছিলাম এতক্ষণ, এইমাত্র তো জাগলাম। ক'টা বাজে ?'

'একটা বেজে গেলো একটু আগে।' অরুণা আস্তে ডান-হাতখানা গরাদের ওপর রাখলো ; শাদা কনুইটা আমার নাকের কাছে চ'লে এলো প্রায়। অরুণার নিশ্বাসপতনের শব্দ শুনলাম।

বললাম, 'এত রাতে আপনি ওখানে ? ওটা বুঝি আপনাদের ভিতরের বারান্দা ?'

'হ্যাঁ, বাবলুর পেন্টুলনটা ঘরে থাকলে কাল শুকোবে না ব'লে বাইরে দড়িতে রাখলাম। হাওয়ায় যদি কিছুটা শুকোয়।'

'আপনি তা হ'লে এতক্ষণ ঘুমোননি?'

'না, ওর ছেলেমানুষির সঙ্গে পাল্লা দিলে তো আমার সংসার চলে না। সবাই ঘুমোলে পর এখন একটু বাইরে এলাম। ভালো লাগছে হাওয়াটা।'

'অত্যন্ত খিটখিটে সুবিনয়।'

'সারাদিন খেটেখুটে আসে। চাকর-বাকর নেই। বাইরের কাজগুলো ওর নিজের হাতে করতে হয়। রাত্রের খাওয়া শেষ হ'লো কি, এটা করবে না, ওটা এখন না, শিগগির আলো নেবাও। অর্থাৎ আমাকে ঘুমোতে দাও।'

'হ্যাঁ, সারাদিন পরিশ্রম ক'রে বাড়ি এসে সকাল-সকাল ঘুমিয়ে পড়তে চায়। আমি লক্ষ্য করলাম। তাই সুবিনয়ের এত তাড়া আপনার পিছনে।' কথার শেষে একটু হাসলাম।

আমার বুকের মধ্যে টিপ্‌টিপ্‌ করছিলো পাছে-না বাড়িতে আমি রেবাকে এটা-ওটার জন্যে বকাবকি করি কিনা অরুণা প্রশ্ন করে। আমাদের মধ্যে যে এ ওকে ব'লে কাজ করানোর সম্পর্কই গ'ড়ে ওঠেনি সে-কথা ও জানে না তো। কাজেই ভয় হচ্ছিলো, প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে ধরা না পড়ি আমি গুলি-খাওয়া বাঘ।

স্ত্রীর ওপর হুকুম চালানোর আগেই ও আমাকে আমার হাত-পা জখম ক'রে দিয়ে চ'লে গেছে। সুবিনয়ের মতো সন্ধ্যাবাতি লাগতে ঘুম-পাওয়া রাত আমার চোখের আগায় দোলে না। আমি নিশাচর।

চেহারা দেখে নারী ব্যর্থ পুরুষকে চিনতে পারে কিনা ভয়ে-ভয়ে অরুণার কালো অতল-গহ্বর চোখের মধ্যে আমি আর-একবার ডুব

দিলুম আর ভয়ে-ভয়ে বললাম, 'হ্যাঁ, সুবিনয়ের যদি আর-একটু আয়-টায় বাড়তো, একটা চাকর রাখার, নিদেন ঠিকে-ঝি রাখার সংস্থান হ'তো।'

আমার ঝি ছিলো কিনা অরুণা প্রশ্ন করলো না। বুদ্ধিমতী প্রসঙ্গটাই এড়িয়ে গেলো।

উঁকি দিয়ে ও আমার বিছানা দেখলো।

'ছারপোকায় কাটে ?'

'না।'

'আপনি আসবেন জেনে তক্তাপোশটায় দুপুরে খুব ক'রে গরম জল ঢেলেছি। সব মরেছে তা হ'লে।'

'তাই মনে হ'চ্ছে।'

স্বল্প হেসে আমি বিচিত্ররূপিণী আর-এক নারীকে দেখলাম। রেবার সঙ্গে একেবারে মিল নেই। রাগী স্বার্থপর স্নেহমমতাহীন রেবা। এটি মা। স্নেহশীলা জায়া।

এদিক থেকে তো বটেই, তা ছাড়া বিয়ের পর থেকে সুবিনয় স্ত্রীর সঙ্গে আছে এক জায়গায় এক বাড়িতে আজ আট বছরের বেশি— এটা তার একান্ত বন্ধু হিসেবে আমার কাছে মামুলি হ'য়ে গেলেও আজ হঠাৎ সব-কিছু যেন চোখে নতুন ঠেকলো। সতেরো নম্বরের অমুক স্ট্রীটের বাড়ি সুবিনয়ের— কথাটা শুনে-শুনে মুখস্থ হ'য়ে গিয়েছিলো। আজ এই গাঢ় বর্ষার রাত্রে সেই ঘরে আশ্রয় নিয়ে আমি একটা ভাঙা জানলার চারখানা জং-ধরা লোহার শিকের ব্যবধান রেখে তার স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলবো এটা আগে জানা ছিলো না।

নতুন, ভয়ংকর নতুন লাগছিলো অরুণাকে। সুসংবদ্ধ শাদা দাঁত দেখিয়ে আর-একবার ও হাসলো। শব্দ ছিলো না হাসিতে। বাঁ-হাতে একটা হ্যারিকেন। ভিতরের চৌবাচ্চা বারান্দা কি পায়খানার জন্যে

ইলেকট্রিক বাতির ব্যবস্থা নেই তাই তেলের ল্যাম্প। সন্ধ্যার পর ওদিকে যেতে হয়েছিলো ব'লে আমাকে ওই আলো দু-একবার ব্যবহার করতে হয়েছে। কিন্তু অনেকক্ষণ জ্বলবার পরও চিমনিটার কোথাও এক-আঁচড় কালি পড়েনি লক্ষ্য করলাম। যেমন এত কাজকর্ম করার পরও অরুণার হাত পা মুখ ঝকঝক করছিলো।

আলো-সমেত হাতটা কপালে তুলে অরুণা চুল সরালো। তাই চোখ দুটো আরো চিকচিক করতে লাগলো।

'ওই শুনুন, আমাদের কর্তার নাক ডাকছে।' ক্ষীণ হাসলো ও।

আমি মাথা নাড়লাম।

'ঘুমোলে সুবিনয়ের নাক ডাকে। কলেজে পড়ার সময় একবার সুবিনয়ের সঙ্গে এক-বিছানায় তাদের হোস্টেলে রাত কাটাতে হয়েছিলো ব'লে আমার জানা আছে।'

'বাবলুটার তো এখন থেকেই ঘুমোলে নাক ডাকে। আরো বড়ো হ'লে সে যে কী গর্জন করবে ভেবে এখন থেকেই আমার মাথা গরম।'

'সুবিনয়ের মতো হয়েছে ছেলে।' আমি ক্ষীণ হাসলাম।

কিন্তু গৃহিণী তাতে বিশেষ সাড়া দিলো না।

আমি বললাম, 'নাক-ডাকা-ঘুম ভালো। ঘুম গাঢ় হ'লে তবে নাক ডাকে, ঘুমটা স্বাস্থ্যের লক্ষণ।'

এবারও অরুণা চুপ ক'রে রইলো।

বললাম, 'সুবিনয়ের বাড়িতে সুনিদ্রা হয় দেখে বাস্তবিক আমার এমন আনন্দ হচ্ছে। আমার বন্ধু ও।' ব'লে সতর্কভাবে বন্ধুপত্নীর চোখের দিকে তাকাই। 'স্বাস্থ্য ভালো না থাকলে খাটবে কি ক'রে।' কিন্তু এবারও চোখের কোনো ভাবান্তর আমি দেখতে পেলাম না। বরং আগের চেয়েও একটু বেশি গম্ভীর হ'য়ে অরুণা বললো, 'তবু তো আমার

মনে হয় ওর ওজন ঠিক নেই। আর-একটু ওজন না বাড়লে চট্ ক'রে স্বাস্থ্য ভেঙে যাবে। চল্লিশের ধাক্কায় টিকবে না।'

সুবিনয়ের চল্লিশের কাছে বয়েস উঠেছে। আমার চেয়ে চার বছরের বড়ো সে। কথাটা হয়তো তার স্ত্রীর জানা আছে ভেবে বয়েস সম্পর্কে আমি কিছু বললাম না।

'এই শীতে ক'টা ক্যালসিয়াম ইনজেকশন না নিয়ে রাখলে আগামী বর্ষায় নির্ঘাৎ অসুখে পড়বে। কিন্তু টাকার অভাবে সেটি হচ্ছে না।'

আমি বৃষ্টির ঝিরঝির শব্দ শুনছিলাম।

যেন অরুণাও একটু-সময় সেই শব্দ শুনতে ঘাড় ফেরালো। তারপর আমার দিকে মুখ ফেরালো।

'আমি-ই ব'লে-ক'য়ে ঘরখানাকে দু-ভাগ করিয়েছি। আত্মীয় আসে থাকবে। যখন না থাকে ভাড়া দিয়ে দাও। অতিরিক্ত ক'টা টাকা আসবে। সেটা দিয়ে তুমি বরং শরীরটাকে আরো ভালো করতে চেষ্টা করো, একটু ওষুধপত্র দুধ ডিম খাও। তা শুনতে কি চায়। একেবারে ছেলেমানুষ।'

আমি অরুণার সঙ্গে স্বল্প হাসলাম বটে। ঈর্ষায় আমার নাভিদেশ পর্যন্ত পুড়ে যাচ্ছিলো। সেইজন্যেই এত কিল-চড় বকাবকি বাল্‌তির মধ্যে মুহুর্মুহু ঠেসে ধ'রে মেরে ফেলার ঘটা! এত আদর!

বললাম, 'হ্যাঁ, সেজন্যেই সুবিনয় আমাকে এখানে পেয়িং গেস্ট্ হ'য়ে থাকতে পাকড়াও ক'রে নিয়ে এলো,' ঠোঁটে একটা মোচড় দিয়ে বললাম, 'বলছিলো তখন, এই টাকায়, মানে থাকা-খাওয়া বাবদ পয়লা মাসে যে-টাকাটা আমি সুবিনয়ের হাতে তুলে দেবো তা দিয়ে সে আপনার চশমা কিনবে।'

'বলেছে নাকি আপনাকে এ কথা। ছি-ছি কী মোটা বুদ্ধি লোকটার।'

ব'লে অরুণা আবার ঘাড় ফিরিয়ে ঝিরঝির বৃষ্টির ফোঁটা দেখতে লাগলো। ভিতরে একটুখানি উঠোনে হ্যারিকেনের আলোয় বৃষ্টি পড়ছে দেখা যাচ্ছিলো।

যেন ঘরের ভিতর কোলের বাচ্চাটা ট্যাঁ ক'রে উঠলো। যেন নিশ্বাসের টানা ঘড়ঘড় শব্দ থামিয়ে সুবিনয় একবার জাগতে চেয়েছে। দমকা হাওয়ায় বৃষ্টির চিরচিরে রেখাগুলি বেঁকে বারান্দায় এসে অরুণার কাপড়ের আঁচলটা ভিজিয়ে দিয়ে গেলো।

কিন্তু সে-সব কোনোদিকে ভ্রূক্ষেপ না ক'রে সুবিনয়ের স্ত্রী আমার জানলার পাশে আরো ঘন হ'য়ে দাঁড়ায়।

'আচ্ছা লোক! অ্যাঁ?' রিমঝিম বৃষ্টির শব্দের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে অরুণা গলাটাকে মোলায়েম ক'রে তুললো। 'শেষটায় আপনাকে আমার চশমার টাকার অভাব হয়েছে ব'লে এখানে ধ'রে নিয়ে এলো, ছি-ছি। আমার ভীষণ লজ্জা করছে।'

লজ্জার হাত থেকে বন্ধুপত্নীকে বাঁচাতে আমি তৎক্ষণাৎ বললাম, 'না, তাতে কি, আমরা বন্ধু। প্রয়োজনে এক-সময় ছাত্রাবস্থায় এ ওকে টাকা দিয়েও তো সাহায্য করেছি।'

যেন কি-একটু ভাবলো অরুণা।

বৃষ্টির শব্দটা আবার হঠাৎ ক'মে যায়। শিশুটি আর কাঁদে না। সুবিনয়ের নাক পূর্ববৎ স্বাভাবিকভাবে ডাকতে থাকে।

'যাকগে, সেজন্যে আমিও খুব ভাবছি না। আপনি তার অন্তরঙ্গ বন্ধু। বলেছে দুঃখ নেই। কিন্তু আমিও দেখে নেবো এ-টাকা দিয়ে আমার চশমা আসে কি ওর দুধ। আপনি সাক্ষী থাকবেন ঠাকুরপো।'

'থাকবো।' খুব কষ্টে অস্ফুট গলায় বলতে পারলাম। কেননা, আমার শ্বাস বন্ধ হ'য়ে আসছিলো স্বামী-সোহাগিনী অরুণার শাদা কনুইটা

আর-একটু বেশি ঢুকে পড়েছিলো আমার অন্ধকার ঘরে। যেন ঘরের অন্ধকারে একটা কোমল শ্বেতাভ কীলক গুঁজে দিয়ে আগের মতো প্রফুল্ল নিশ্চিন্ত হ'য়ে ও নিশ্বাস ফেলতে পারলো।

'ওর বাল্যবন্ধু, কাজেই আমাদের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়, তার চেয়েও বড়ো আপনি। আপনার ওপর যতটা দাবি খাটে আর কারোর ওপর খাটে না। কথাটা সন্ধ্যেবেলা বলবো ভেবেছিলাম, সুযোগ পাইনি। এখন ও ঘুমিয়েছে তাই বলতে এলাম। টাকা-পয়সা সুবিধামতো যা পারেন আপনি দেবেন, তার জন্যে খুব যে একটা কড়াকড়ি নিয়ম থাকবে আমি তা চাই না। হ্যাঁ, নিয়মের মধ্যে একটা জিনিস আপনাকে মেনে চলতে হচ্ছে, দু-টাকা এক-টাকা পাঁচ দশ কুড়ি— যখনই যা দিচ্ছেন সবটাই যেন আমার হাতে দেওয়া হয়। না, ওর হাতে একটি পয়সা না, বুঝতে পাচ্ছেন?'

মাথা নাড়লাম। মনে-মনে বললাম এই জন্যেই চোখে ঘুম নেই। কিন্তু সে-কথা আর প্রকাশ করি কি ক'রে!

চুপ ক'রে রইলাম।

হ্যারিকেন-ধরা বাঁ-হাতে আবার কপালের চুল সরালো। আমি বললাম, 'যান, এইবেলা ঘুমোন গে, আমার মনে থাকবে।'

আলস্যের একটা হাই ভেঙে অরুণা কীলকের মতো কনুইটা সোজা ক'রে অন্ধকারে আমার মুখের সামনে ঝুলিয়ে দিলে।

'বউদি বুঝি শিগ্‌গির আসছেন না?'

'না।'

যতটা সম্ভব গলা সংযত রেখে বললাম, 'সামনে তার এগ্‌জামিন।'

'বাবা, কি ক'রে যে পারে এ-সব মেয়ে স্বামীকে ছেড়ে থাকতে—' অরুণা বৃষ্টির দিকে চোখ ফেরালো। কিন্তু বৃষ্টি তখন নেই। কেবল টিনে জল পড়ার টপটপ শব্দ হচ্ছিলো।

আমি চুপ। আমি চুপ ছিলাম, কেননা ঈর্ষার আগুন আমার নাভি-দেশ নিয়ে প'ড়ে না থেকে তখন মাথার ভিতর আগুন জ্বালিয়ে তুলছিলো। বেশি রাত্রি হওয়ার দরুন অনিদ্রায় চোখ জ্বালা করছিলো, কপালের রগ দুটো দপ্‌দপ্‌ করছিলো।

আর বাইরে সেই একঘেয়ে ঢপঢপ-ঢপঢপ আওয়াজ। আমার স্নায়ুর মধ্যে সেই বিশ্রী শব্দটা প্রবেশ ক'রে শরীরটাকে ভয়ংকর ক্লান্ত অবসন্ন ক'রে তুললো।

যেন আর-একটা কি কথা বলতে অরুণা সোজা হ'য়ে দাঁড়ায়। হাতের আলোটা নড়েচড়ে ওঠে। পিছনে দড়িতে ভিজে পেণ্টুলনের ছায়াটা দোলে। কেবল ওর ডিমের মতো ঈষৎ লম্বাটে মসৃণ মুখখানা স্থির। রাত্রির মতো গভীর কালো চোখ-জোড়ায় পলক পড়ছিলো না। আমি, আমি সময়ের কিছু অতিরিক্ত সময় নিষ্পলক চোখে সন্তানসম্ভবা নারীর রূপ দেখলাম।

'যান,' তিক্ত নীরস গলায় বললাম, 'রাত হয়েছে, ঘুমোন গে। এক আধলাও আমি সুবিনয়কে দিচ্ছিনে। সব, হয়তো আমার রোজগারের পুরো টাকাটাই আপনার হাতে তুলে দেবো।'

'পাগলের মতো কথা বলছেন।' অরুণা অদ্ভুত চাপা গলায় খিলখিল ক'রে হাসলো। অন্ধকারে যে-হাতটা আমার মুখের সামনে বুকের সামনে ঝুলিয়ে রেখেছিলো সেটা আস্তে আন্দোলিত ক'রে বললো, 'সব আমায় দিয়ে দিলে রেবার জন্যে রাখবেন কি। পরে ও এসে আমার চুল ছিঁড়ে খাবে।'

'না, সে আর আসবে না।' কঠিন ক্রূর গলায় কথাটা কোনোরকমে ব'লে শেষ ক'রে আমি হিংস্র উন্মত্ত পশুর মতো ওর অনাবৃত শাদা বাহুটা সজোরে চেপে ধরলাম। যেন প্রতিশোধ নেবার আর-কোনো

উপায় ছিলো না ব'লে আমাকে তা করতে হয়েছিলো। আমার হৃদ-পিণ্ডের ঢুব্‌ঢুব্‌ আওয়াজটাই কানে বাজছিলো শুধু। আর-কোনো শব্দ ছিলো না। যেন টিনের ওপর জল পড়া থেমে গেছে তখন। ঢং-ঢং ক'রে পাশের বাড়ির দেয়াল-ঘড়িতে দুটো বাজলো। আর পার্টিশনের ওপারে নাকের ঘড়ঘড় ধ্বনি।

আশ্চর্য! সময়ের অতিরিক্ত সময় অরুণা আমার বজ্রমুষ্টির মধ্যে ওর নরম তুলতুলে হাতটা ধ'রে রাখতে দিয়ে সরিয়ে নেবার ন্যূনতম চেষ্টা না ক'রে ধীর ঠাণ্ডা গলায় বললো, 'এ-মাসে ওর চিকিৎসাটা হোক, সামনে আবার আপনার টাকা পেলে ওর জামা কাপড় করাতে হবে, ছি-ছি কী ছিরি হয়েছে পোশাকের, এই নিয়ে তো ও আপিস-কাছারি করছে!'

আমার বজ্রমুষ্টি শিথিল হ'য়ে হাতটা নিচে গড়িয়ে পড়লো।

/////////////////////////////////

মঙ্গলগ্রহ

/////////////////////////////////

সেদিন বুঝলাম, আমাদের সংসার ছাড়াও সংসার আছে, আমাদের পৃথিবীর বাইরেও পৃথিবী আছে।

অহরহ শোক তাপ অভাব অনটন আধিব্যাধি অর্ধাঙ্গিনীর অব্যক্ত গুঞ্জন এবং আধ-ডজন অপোগণ্ডের দুড়দাড় মাতামাতি একদিন, একদিন অন্ততঃ কিছুক্ষণের জন্যে থেমে গিয়েছিলো। সবাই অবাক হ'য়ে দেখলো নতুন সেই গ্রহ।

আমরা ভাবতে পারিনি, আমি, আমার স্ত্রী, ছেলে-মেয়েরা। যে-বাড়ির ইট সিমেণ্ট খ'সে পড়ছে, উঠতে-নামতে দুর্বল হৃদপিণ্ডের মতো সিঁড়িটা কাঁপে, ফুটো ছাদ দিয়ে জল পড়ছে এখন-তখন, সেখানে হঠাৎ শাড়ি গয়নার ঝলক, সাবান পাউডার দামি সিগারেটের ঘি গরমমশলা মাংসের গন্ধ কেমন অদ্ভুত লাগলো। আমাদের ঘরের টিকটিকিটা পর্যন্ত অবাক হ'য়ে চেয়ে দেখছিলো প্যাসেজের ওপারে লাল আলোয় ভরা জানলাটার দিকে।

সন্ধ্যার দিকে বুঝি এসে উঠেছিলো। এরই মধ্যে জিনিসপত্র জায়গা মতো সাজিয়ে-গুছিয়ে ফিটফাট। কোনো ঝামেলা, কোনো ঝঞ্ঝাট, একটু শব্দ পর্যন্ত না।

রেশনের আটার সংক্ষিপ্ত ক'খানা রুটি গলাধঃকরণ ক'রে আস্তে-আস্তে আমার সন্তানেরা ঘুমিয়ে পড়লো। টারপিনের অভাবে কেরোসিন আর কর্পূরের এক রাসায়নিক মিশ্রণ তৈরি ক'রে গৃহিণী তখন দেয়ালে পিঠ রেখে মেঝেয় ব'সে পায়ে মালিশ করছে। আর আমি, লাল-ফিতে-বাঁধা

আপিসের ফাইল সামনে নিয়ে ব'সে কখনো ঢুলছি, হাত দিয়ে মশা তাড়াচ্ছি একেক বার। লাল, মঙ্গলগ্রহের মতো লাল স্তব্ধ সেই ঘরের দিকে চোখ পড়তে সত্যি আর চোখ ফেরাতে পারলাম না।

সস্তা বাড়িতে ইলেকট্রিক আলোর ব্যবস্থা থাকে না। আমি কখনো মোমবাতি, কোনোদিন রেড়ির তেল দিয়ে কাজ সারি। কেরোসিন যা জোগাড় করি হেমলতার বাতের দৌলতে নিঃশেষ হ'য়ে যায়। তেমনি এ-বাড়ির অন্য সব ঘরে। কারো টিমটিমে, কারো-বা তা-ও না। কাজেই অন্ধকার এই জগতে এমন চমৎকার আলোয় টলটলে একটা ঘর যদি অনেক রাত অবধি জেগে থাকে সেদিকে চেয়ে আপনিও কি জেগে থাকবেন না! তাকিয়ে থেকে ভাববেন, এরা কারা। কেমন এই নতুন গ্রহের বাসিন্দারা। বুঝলাম হ্যাজাক জ্বলছে। আর ডোমটা শাদা না হ'য়ে লাল হওয়াতে ঘরটা যেন আরো সুন্দর রহস্যময় হ'য়ে উঠেছে। আমার চোখে পলক পড়লো না। মেয়েটি, মেয়ে কি মহিলা তখন ঠিক বুঝলাম না। জানলার কাছে দু-বার এলো। একবার একটা ডিস নিয়ে গেলো, একবার এসেছিলো সস্‌প্যান নিতে। থমথমে যৌবন, বিশাল বিকশিত খোঁপা। নিশ্বাস বন্ধ ক'রে আমি চুপ ক'রে দেখছিলাম। অনেক রাতে একটা লোক ঢুকেছিলো ঘরে। রোগা টিংটিংয়ে টাই-স্যুট পরা। যেন অনেক হাঁটাহাঁটি ক'রে অনেক ক্লান্তি নিয়ে এখন এখানে তার আশ্রয়। সিগারেট টানলো ওই জানলার ধারে ব'সে আট-দশটা। দৃশ্যটা আর ভালো লাগছিলো না ব'লে শুয়ে পড়লাম। যেন লোকটা না হ'য়ে সেই মেয়েটি যদি আরো দু-একবার জানলায় আসতো, একটু দাঁড়াতো, ভালো লাগতো। শুয়ে-শুয়ে ভাবলাম, কালো-স্যুট-পরা মূর্তিটা চাঁদের কলঙ্কের মতো হুট্ ক'রে ওখানে এসে ওটা কেন জুটলো। বেশ তো ছিলো।

সকালে অবশ্য আমার সংসার আগে জাগে, তারপর পাশের ললিত নন্দীর ঘর, ফালু পালের। আমরা কেরানী, আমাদের আগে জাগতে হয়। এখন আমাদের সংসারে শব্দ বেশি, তাড়াহুড়া খুব। চিৎকার ক'রে ছেলে দুটো ইস্কুলের পড়া তৈরি করছে, প্রীতি বীথি অর্থাৎ আমার বড়ো দু-মেয়ে রান্নাবান্না করছে। অসাড় পা দুটো মেঝের ওপর ছড়িয়ে দিয়ে হেমলতা চালের কাঁকর বাছচে। আড়চোখে ওদিকে চেয়ে দেখলাম প্যাসেজের ওপারে পার্টিশনের গায়ে হলদে রোদ এসে গেছে। কিন্তু সেখানে এখনো ঘুম। দরজাটা বন্ধ।

না, রাত্রে ওদের ঘরের উজ্জ্বল আলো আর আমাদের ঘরের রেড়ির বাতির বৈষম্যটা যতই চোখে লাগুক, যত উজ্জ্বল ও অদ্ভুত ঠেকুক না কেন, এখন, সকালে, যখন একই রকমের বিবর্ণ ধূসর কাকগুলোকে ওদের ছাতের কার্নিশে এবং আমার ঘরের কার্নিশেও ব'সে থাকতে দেখলাম তখন অনেকটা স্বস্তি পেলাম। হোক বড়োলোক— ভাবলাম— এক বাড়িতে যখন ঘর ভাড়া নিয়েছে তখন সেই শ্যাওলা-পড়া পুরোনো চৌবাচ্চার জলই মুখে দিতে হবে, পচা ভাঙা সিঁড়ি দিয়ে ওঠানামা করতে হবে। উপায় নেই। ট্রেনের তৃতীয় শ্রেণীর আরোহীর মনের ভাবটা হ'লো আমার। হঠাৎ যদি সচ্ছল সম্ভ্রান্ত কোনো যাত্রী এসে ওই কামরায় ঢোকে এবং একই বেঞ্চিতে আমার পাশে বসে তখন কি এই ভেবে উৎফুল্ল হবো না যে আমার অসুবিধাগুলি তোমাকেও ভোগ করতে হবে, বৈষম্যটা অন্ততঃ এদিক দিয়ে থাকবে না। ধীরে-ধীরে আলাপ-পরিচয় যে না হবে তা-ই বা কে বলতে পারে এবং তাই তো স্বাভাবিক। নিমের দাঁতন নিয়ে দাঁত সাফ করার অছিলায় ওদিকের পার্টিশন-সংলগ্ন দরজাটার দিকে অনেকক্ষণ সতৃষ্ণ নয়নে তাকিয়েছিলাম। যেন একটা কাজ পেয়েছি।

হঠাৎ পিছনে যেন কে এসে দাঁড়ালো।

'বাবা স্নান করো, অফিসের বেলা হ'লো।'

চমকে উঠলাম। প্রীতি। রুষ্ট হ'য়ে উঠি।

'অফিসের বেলা হ'লো আমি চোখে দেখতে পাচ্ছি না?'

প্রীতি একটু অবাক হ'য়ে আমার মুখের দিকে তাকায়। কেননা বেলা আটটা না বাজতে আমার তরফ থেকে রোজ রান্না নামানোর তাগিদ হয়, ওরা দু-বোন জানে। চুপ ক'রে ঘরে ঢুকলাম।

দেখি আমার বড়ো ছেলে মণ্টুর কাঁদো-কাঁদো চেহারা। রাগ আরো বেড়ে গেলো।

'কি হয়েছে শুনি?'

'আমার জ্যামিতি পড়া তুমি আর বুঝিয়ে দিলে না বাবা।'

'অফিসের চরকায় তেল দিয়ে কূল পাই না, তোর পড়া দেখিয়ে দিই কখন।'

চুপ হ'য়ে গেলো মণ্টু। তাড়াতাড়ি স্নান সেরে খেতে বসি। ভাত দেয় ছোটো মেয়ে বীথি। বুঝি হাত থেকে চার-ছটা ভাত গড়িয়ে মাটিতে পড়েছে। রীতিমতো গর্জন ক'রে উঠলাম। 'একটু সাবধান হবি— অমন ক'রে জিনিস লোকসান ক'রে আমায় রাস্তায় বসাবি নাকি। যে-কোনো-দিন রেশন বন্ধ হ'য়ে যেতে পারে।'

অধোমুখে বীথি সামনে থেকে স'রে গেলো। শাদা নিষ্প্রভ দুটো চোখ মেলে হেম আমার মুখের দিকে চেয়ে থাকে, ওর মুখের দিকে না তাকিয়েও বেশ টের পাই। কর্পূর-কেরোসিনের গন্ধটাও যেন নতুন ক'রে নাকে এসে লাগে।

জামা কাপড় প'রে ধনেচাল চিবোতে-চিবোতে যখন বাইরের বারান্দায় এসে দাঁড়ালাম, দেখি প্যাসেজের ও-পাশের দরজা খুলেছে। এতক্ষণে ঘুম ভাঙলো। এবং ঘুম যে ভেঙেছে চোখেই দেখতে পেলাম।

শুকনো খোঁপার আধখানা মুখ থুবড়ে ঘাড়ের ওপর পড়েছে। ভাঙাচোরা আঁচলের ঢেউ। শরতের কাঁচা রোদ গালে কানে পিঠে লেগেছে। মেয়েটি— মেয়ে কি মহিলা তখনো ধরা গেলো না— ওদিকের গলির দিকে মুখ ক'রে রেলিং ঝুঁকে দাঁড়িয়েছে। তাই মুখখানা ভালো দেখা হ'লো না।

অবশ্য বুঝলাম রাত্রে দু-বার যাকে জানলায় দেখেছিলাম। একবার এসেছিলো ডিস নিতে, একবার এসে একটা সস্‌প্যান নিয়ে গেলো। যেন জানলার গায়ে ঠেকানো ছোটো একটা শেলফ্‌ বসানো হয়েছে ও-ধারে।

সিঁড়ি দিয়ে নামতে-নামতে রাত্রের ছবিটা ভাবি।

রাস্তায়, এমন কি ট্র্যামের ভিড়ে দাঁড়িয়েও রৌদ্রে-দাঁড়ানো সেই মূর্তিটা মনে-মনে আঁকি। অফিসে লেজারের সামনে ব'সেও। তারপর সেই স্যুট-পরা আদমীর চেহারা যখন মনে পড়লো ভিতরটা কেমন ভার হ'য়ে গেলো। কাজে মন দিলাম।

বিকেলে বাড়ি ফিরে দেখি মণ্টুর হাতে চকোলেটের বাক্স, ফণ্টুর হাতে আপেল।

'কোথা পেলি এ-সব, কে দিলে?' চোখ বড়ো হ'য়ে গেলো আমার।

প্রীতি পেয়েছে ব্লাউজের টুকরো, বীথি পেয়েছে শাড়ি।

'কে দিয়েছে শুনি না?'

'লীলাদি,' বীথি বললে খুশি চোখে।

'খুব বড়োলোক,' প্রীতিও সামনে এলো। 'লীলাদির বর ইঞ্জিনিয়ার।'

আমার কাপড় জামা বদলানো হ'লো না। হাত-মুখ ধোওয়া নেই। হাতে নিয়ে জিনিসগুলো নেড়েচেড়ে দেখছি। 'পাটনা থেকে এসেছে ছুটিতে,' বললে বীথি, 'ভালো বাড়ি পাওয়া গেলো না তাই এখানে।' বীথির মুখের দিকে উৎসুক চোখে তাকাতে যাবো এমন সময় দরজায় ছায়া পড়লো।

মেয়ে নয়, মহিলা।

খোঁপায় চওড়া কালো-পাড় আঁচল উঠেছে। জোড়া ভুরু ধনুকের মতো বাঁকা। তনু মধ্যম গড়ন। জীবনে এই আমি প্রথম দেখলাম পরিপূর্ণ যৌবন।

প্রীতি বীথি বাইশ উনিশে পা দিয়েছে। যৌবনের দেখা পায়নি ওদের শরীর। আর সেই বীথি যখন পেটে, কুড়ি বছর বয়স থেকেই হেমলতার বাত, তখন থেকে আজ অবধি দু-পায়ের ওপর সোজা হ'য়ে ও দাঁড়াতে পারেনি। আমার চোখ তখন মাটির দিকে, স্যাণ্ডেলের ফাঁকে, পায়ে আলতার ছোপ।

'এই অফিস থেকে ফিরলেন বুঝি ?'

. 'হ্যাঁ,' ঘাড় তুললাম, মুখখানা আবার দেখলাম। কপালে হাত ঠেকিয়ে মহিলা নমস্কার জানালে। আমিও।

'একটু কষ্ট করবেন,' চৌকাঠের গায়ে একটা হাত রাখলো লীলাময়ী, এক-পা বাড়ালো সামনে। 'ওকে দিয়ে তো কাজ হবে না, কলকাতায় এসেছে কেবল ঘুরতে। সারাদিন বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করা ফুরোয় না।'

হেসে বললাম, 'বলুন, কিছু করতে হবে ?'

লীলাময়ী হাসলো লজ্জায়, নাকি চট্ ক'রে আমি রাজী হয়েছি ব'লে! 'একটু মাংস এনে দিতে হবে বাজার থেকে।'

'ও আবার একটা কাজ,' ন্যুয়ে পড়েছিলাম, সটান সোজা হ'য়ে দাঁড়ালাম। 'এখুনি এনে দিচ্ছি।'

চোখে ঠোঁটে হাসির ঝলক লেগে আছে তখনো। লীলাময়ী হাত বাড়িয়ে একটা দশ টাকার নোট দিলে।

'দু-বার ভেবেছি আপনাকে বলবো কিনা, আমার তো আর লোকজন নেই।'

'দ্যাখো কথা,' হেসে বললাম, 'এতে লজ্জার কি আছে, তবে আর এক-বাড়িতে থাকা কেন।' ব'লে প্রীতির চোখের দিকে তাকালাম। ও অন্যদিকে চোখ সরিয়েছে। বীথি নেই আর সেখানে।

'আপনার ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে আলাপ হয়েছে,' লীলাময়ী বললো, 'আমাদের বউদি বুঝি ইন্‌ভ্যালিড?'

কৃতার্থের হাসি হেসে চৌকাঠ পার হ'য়ে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াই। আমার পিছনে ও সিঁড়ি অবধি এলো।

'নতুন জায়গায় এসে উঠলে কত কি দরকার, ওর তো কোনোদিকে মনোযোগ নেই, কী মুশকিলে না পড়েছি আমি।'

'আ, কেন আপনি মন খারাপ করছেন।' নির্জন সিঁড়ি পেয়ে আমার গলা আরো ঝরঝরে হ'য়ে গেলো। 'যখন যা দরকার বলবেন, এটুকুন উপকার যদি না করলুম তবে আর একত্র বসবাস কেন।' নিবিড় পরিচ্ছন্ন যৌবনের সামনে দাঁড়িয়ে আমার শুকনো বুকের ভিতরটা কাঁপছিলো। চোখে পলক পড়লো না।

'বেশ কচি পাঁঠার মাংস হয় যেন।'

'তা আর বলতে হবে না।' লম্বা পা ফেলে বাজারের দিকে ছুটলাম।

এই লীলাদি। লীলাময়ী বা লীলাবতীও হ'তে পারে। আমার যেন লীলাময়ী মনঃপূত হ'লো। একদিনে এতটা অগ্রসর, এ যেন স্বপ্নের অতীত। না, এমন পরিষ্কার স্বচ্ছ চোখে কোনো নারী আমার দিকে তাকায়নি, এমন সুন্দর সহজ গলায় কথা বলেনি। আমার যৌবনের বা কেরানী-জীবনের ইতিহাসে তার চিহ্ন নেই। আমার নিজের মেয়ে তো প্রীতি বীথি। বলতে পারো বয়স হয়েছে; আজো পাত্রস্থ করা হয়নি ব'লে মন ভার, মুখ ভার। কিন্তু ভালো ক'রে বাপের সঙ্গে দুটো কথা বলতে আপত্তি কি। ভয়ে চোখে-চোখে তাকায় না, যেন আমি দানো, খেয়ে

ফেলবো কি গিলে ফেলবো। সুন্দর চোখের কথা না-হয় না-ই বললাম। আর তাকাবে কে ? হেমলতা ? মরা মাছের মতো শাদা ফ্যাকাশে চোখ দুটো মেলে ও আমার দিকে তাকায় ঠিক বলা চলে না, কোনোমতে জেগে থাকে। নিচে কলতলায় ললিত নন্দীর বউ-এর সঙ্গে একদিন চোখোচোখি হয়েছিলো, হয়েছিলো মানে হবার উপক্রম হচ্ছিলো, সাত হাত এক ঘোমটা টেনে হাতের শূন্য বাল্‌তি চৌবাচ্চার ধারে রেখে স'রে গেছে আমাকে কল ছেড়ে দিয়ে। ফালুর জেনানাকে আমি কলতলায় দূরে থাক, কোনোদিন জানলায় আসতেও দেখলাম না। আর তাকাবে কে ? ট্র্যামে-বাসে ? পঞ্চাশের কাছাকাছি বয়সের কোনো কেরানীর দিকে কেউ কি কখনো তাকায় ?

• পাঁচ-সাতটা দোকানে ঘোরাঘুরি ক'রে কচি ও তাজা পাঁঠার মাংস যোগাড় ক'রে বাড়িব দিকে চললাম। ভাবছি তখন, ভাবতে-ভাবতে চলেছি। কথাটা কানে লেগে আছে : ওর কোনোদিকে মনোযোগ নেই। মনোযোগ যে নেই কাল রাত্রে দূর থেকে একবার দেখেই আমি বুঝতে পেরেছিলাম। ফিরিঙ্গি ছোঁড়াদের মতো বাউণ্ডুলে চেহারা। আট-দশটা সিগারেটই শেষ করলো জানলায় দাঁড়িয়ে। হাওয়া-খোর।

সিঁড়ির কাছে এসে থমকে দাঁড়ালাম। আমার অন্ধকার ঘর। বুঝলাম আজ মে ম, রেড়ি কোনোটাই যোগাড় করা হয়নি। যদি-বা কিছু সঞ্চিত থাকে আমার অপেক্ষায় রেখে দেওয়া হয়েছে। তেমনি ফালুর ঘর অন্ধকার। ললিতের ঘরে টিম্‌টিমে কি-একটা জ্বলছে যেন। না-থাকার সামিল। কেবল একটি জানলায় তীব্র উচ্ছ্বসিত আলোর বন্যা। সত্যি যেন আমাদের ঘরের পাশে নতুন এক গ্রহ এসে বাসা বেঁধেছে।

প্যাসেজ পার হ'য়ে পার্টিশনের কাছে যেতে ও বেরিয়ে এলো। যেন এইমাত্র কল-ঘর থেকে ফিরেছে। হাতে একটা ভিজে তোয়ালে,

এলোচুল। বৃষ্টি-ধোওয়া কদমফুলের সৌরভের মতো মিষ্টি একটা গন্ধ আমার নাকে লাগলো।

'আপনাকে খুব কষ্ট দিলাম।'

'কেন ও-কথা ব'লে বার-বার মনে কষ্ট দিচ্ছেন।' মাংসের পুঁটুলি লীলাময়ীর পায়ের কাছে সিমেণ্টের ওপর রাখলাম।

'একটা চাকর পর্যন্ত না,' নুয়ে পুঁটুলিটা ও হাতে তুলে নিলে। 'আমরা যখন ছুটিতে যাচ্ছি চাকর দুটোকে ছেড়ে দাও, ঘুরে আসুক ক'দিন দেশ থেকে— কী বুদ্ধিমানের কথা শুনুন— কলকাতায় ঢের লোক পাওয়া যাবে।'

বুদ্ধিমানটি কে আন্দাজ করতে কষ্ট হ'লো না। এবং বুদ্ধির বহরটা আরো বড়ো ক'রে দেখাবার সুযোগ এলো আমার, গম্ভীর গলায় বললাম, 'রাস্তায় দাঁড়িয়ে কাঁদলেও চাকর জুটবে না, বাড়ি পাওয়ার মতোই কঠিন। উনি এখনো ফেরেননি বুঝি ?'

'রাত বারোটার আগে!' কৌতুকোজ্জ্বল কালো চোখ আমার মুখের ওপর মেলে দিয়ে যুবতী হাসলো। 'ভালো লোক ঠাওরেছেন।'

'রোজই এমন করেন নাকি ?' কৌতূহল খুব বেশি হ'লো, একটু হাসলামও। 'অনেক রাতে ফেরেন বুঝি ?'

'রোজ, চিরকাল।' যেন চিরকালের এই অভ্যাসটা ধাতস্থ হ'য়ে গেছে লীলাময়ীর, খারাপ লাগে না, নইলে এমন ঝরঝরে গলায় হাসবে কেন। 'ওখানে যেমন করেছে, এখানে এসেও দেখছি তাই, বন্ধুর ওর শেষ নেই, হয়তো দুপুররাতে এসে বলবে, খেয়ে এসেছি অমুকের বাড়িতে, কি অমুকের সঙ্গে হোটেলে, আমি খাবো না, এই রকম।'

রকমটা কি ভালো ? মুখ দিয়ে আমার প্রায় বেরিয়ে পড়েছিলো, গম্ভীরভাবে বললাম, 'না, এতটা বাড়াবাড়ি ঠিক না।'

চৌকাঠের ওপর চোখ রেখে কি যেন ও ভাবলো। নাকি ভাবনা ঝেড়ে ফেলার জন্য ফের লীলাময়ী ঠোঁটে হাসি টেনে আনলো। এবার আমার প্রসঙ্গ।

'বেশ পরিশ্রম করতে পারেন আপনি।'

'নিশ্চয়,' দৃপ্ত পৌরুষের গলায় বললাম, 'পুরুষের এত গা ভাসিয়ে দিলে সংসার চলে না। সন্ন্যাসী বাউলের সংসার নেই।' ইঙ্গিতটা ইচ্ছা ক'রেই একটু ভালোর দিকে রাখলাম।

ছুরির ফলার মতো ধারালো চকচকে দুটো চোখ আমার আপাদমস্তক বিদ্ধ করলো। ছেঁড়া জামা আমাব ? ছেঁড়া জুতো গরিব কেরানী ? না, এ-চাউনির অর্থ অন্যরকম। এ স্বতন্ত্র।

'এই অফিস থেকে ফিরলেন, এই আবার ছুটলেন বাজারে, একটু আলসেমি নেই।'

'আলসেমিটা মনের,' ঠোঁট টিপে হাসলাম, 'নাকি এ-বয়সে এতটা ছোটাছুটি মানায় না বলছেন আপনি ?'

কিছু বললো না, লীলাময়ী ঠোঁট টিপে হাসলো।

বললাম, 'যাই, আপনার কাজকর্ম আছে।'

'হ্যাঁ, তা আছে বৈকি।' দীর্ঘশ্বাস ফেলে যুবতী ঘাড় ফেরালো, শরীর ঘোরালো। অপরূপ দীর্ঘ দেহ। ঘন চকচকে ছোপ দেওয়া শাড়ি পরনে। মনে হ'লো মঙ্গলগ্রহের লাল অরণ্যে নিঃশব্দচারিণী কোনো বাঘিনী। মাংসের পুঁটুলিটা হাতে ক'রে চৌকাঠেব ওপারে পার্টিশনের আড়ালে অদৃশ্য হ'লো। সুন্দর, গর্বিত, নির্ভীক। আমি চেয়ে রইলাম।

ঘরে ঢুকতে অন্ধকারে একটা ফুঁসফাঁস শব্দ কানে এলো। মেজাজ কেমন গরম হয়, ভাবুন একবার। দরজার কাছে, অনুমান করলাম, বীথি ওটা।

'কি হয়েছে শুনি, কাঁদছে কে ?'

'মণ্টু।' বুঝলাম প্রীতির গলা। 'ইস্কুলে জ্যামিতি পড়া দিতে পারেনি, মাস্টার মেরেছে।'

'বেশ করেছে,' হাল্কা গলায় বললাম, 'এক-আধটু মার খাওয়া ভালো।'

প্রীতি আধ-ইঞ্চি সেই মোমের টুকরোটা জ্বাললো। জামা কাপড় ছেড়ে মুখ-হাত ধুয়ে খেতে বসলাম। বললাম, 'এ-বয়সে ইস্কুলে সবাই মার খায়। মার না খেয়ে কেউ মানুষ হয়েছে ? উকিল, মোক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার, কেরানী, প্রোফেসার— মার একদিন সবাই খেয়েছে।' মণ্টু আমার কথাগুলি কান পেতে শুনলো। প্রীতি, বীথি, ফণ্টু আর ওদের মা। যেন এমন মিষ্টি কথা আমার মুখ দিয়ে কোনোদিন বেরোয়নি। গলা-মোমের মাঝখানে সল্‌তের টুকরোটা সাঁতার কাটতে-কাটতে ফুটুস ক'রে এক-সময়ে নিভে গেলো। আমারও খাওয়া হ'য়ে গেছে। এবং অন্ধকার ঘরে ব'সে থাকার কোনো মানে হয় না বা এতগুলি মিষ্টি কথার পর আবার কি অপ্রিয় কথা ব'লে হেমলতার সংসারকে হতচকিত ক'রে দিই এই ভয়ে আস্তে-আস্তে বাইরে বারান্দায় এসে দাঁড়ালাম। ললিতের ঘরের টিম্‌টিমে আলোটাও নিভে গেছে এখন। পাড়াটাই ঝিম্ মেরে যায় রাত আটটার পর। তাই ও-ঘরের লাল-আলো-জ্বলা জানলাটা আরো বেশি কাছে মনে হচ্ছে যেন। হাত বাড়ালে নাগাল পাবো।

পায়ের শব্দ শোনা যায় ? বাসনের ঠুন্‌ঠান্ আওয়াজ ?

কান পেতে রইলাম। দেখলে মনে হয় যেন ও-ঘরে এই সবে সন্ধ্যা নেমেছে, গা ধুয়ে চুল বেঁধে পরিপাটি ক'রে লীলাময়ী রাঁধতে বসেছে। আঁটোসাঁটো নিটোল নিখুঁত মূর্তি আমার চোখের সামনে ভাসছে। ধ্যানস্থের মতো জানলাটার দিকে চেয়ে রইলাম। না, এদিকে কিন্তু একবারও এলো না, ডিস বা বাটি নিতে। কেবল ওদিকের দেয়ালে একবার

গোল-মতো একটা ছায়া দেখলাম। বুঝলাম দেয়ালে-ঢাকা ওই অংশটায় ব'সে লীলাময়ী রাঁধছে। আর উল্টোদিকে ছায়া পড়েছে। একবার কাঁপছে আবার স্থির হ'য়ে আছে।

বিড়িটা নিভে যেতে আর-একটা ধরাতে যাবো হঠাৎ যেন নিচের সিঁড়িতে কার পায়েব শব্দ শুনে চমকে উঠলাম। ইঞ্জিনিয়ার?

শ্বাস বন্ধ ক'রে কান পেতে রইলাম। আর শব্দ নেই। বোঝা গেলো ইঁদুর। পুরোনো বাড়িতে ইঁদুরের উপদ্রব বেশি। ময়লা বেরোবার পাইপ বেয়ে নির্বিবাদে ওরা ওপরে উঠে আসে। মোটা ধোঁয়া-রঙের বিশাল এক-এক ইঁদুর।

লীলাময়ীর ঘরে ইঁদুর ঢোকে? কথাটা কেন জানি মনে হ'লো। জানলার দিকে চেয়ে ঢোক গিললাম। কল্পনা করলাম, সত্যি যেন একটা নোংরা হোঁৎকা ইঁদুর ঢুকেছে ও-ঘরে। লীলাময়ী আঁৎকে উঠবে ভয়ে? না চিৎকার ক'রে উঠবে! না রাগে দাঁত ঘ'ষে হাতের তপ্ত খুন্তিটা ইঁদুরের মস্তকে ফুঁড়ে দেবে! নাকি ঘাড় ফিরিয়ে নরম ঠাণ্ডা চোখে একবার মাত্র তাকাতে বাসনকোসনে গা না ঠেকিয়ে ইঁদুরটা ভালোমানুষের মতো লীলাময়ীর শাদা সুন্দর পায়ের কাছ দিয়ে সুড়সুড় ক'রে নর্দমার পথে বেরিয়ে গেলো।

তাই— তাই হবে। এ তো আমাদের ঘরে ইঁদুর ঢোকা নয় যে ওটাকে দেখেই মালিশরতা হেমলতা যন্ত্রণায় ককিয়ে উঠবে, প্রীতি বীথি মোটা থপ্‌থপে পা ফেলে ঝাঁটা নিয়ে আসবে ছুটে ইঁদুর মারতে, মণ্টু ফণ্টু ঘরময় দাপাদাপি করবে, সে এক কাণ্ড! শুনলাম দূরের পেটা-ঘড়িতে ঢং-ঢং ক'রে দশটা বাজলো।

পা বদল ক'রে ফের রেলিং-এ ভর দিয়ে দাঁড়াবো এমন সময় প্যাসেজের ওপারে পার্টিশনের দরজা ন'ড়ে উঠলো। প্রথমে আলোর

একটা রেখা, তারপর আলোর রেখার মতোই উজ্জ্বল দীর্ঘ সেই দেহ। বুকের ভিতর দুব্‌দুব্‌ করছে আমার। প্যাসেজের মাঝামাঝি যখন এলো মুখখানা আর ভালো দেখা গেলো না। আশ্চর্য, লীলাময়ী এদিকেই আসছে, আমার ঘরের দিকে।

রেলিং ছেড়ে তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেলাম।

'ওরা ঘুমিয়ে পড়েছে? ছেলে-মেয়েরা?'

'প্রীতি বীথি? মণ্টু ফণ্টু?' বললাম, 'কিছু দরকার আছে?'

'একটু কারী খাবে ওরা।'

অন্ধকারে আন্দাজ করলাম ওর হাতে অ্যালুমিনিয়ামের একটা বাটি।

'এত রাতে ওটা আপনি হাতে ক'রে এনেছেন! তা ছাড়া ওইটুকুন তো ছিলো, আমি নিজে বাজার করেছি।'

'তাই ব'লে সব একলা খেতে হয়!' হাসলো লীলাময়ী, অন্ধকারে বৃষ্টির ফোঁটার মতো সে-হাসির শব্দ।

বললাম, 'তা ছাড়া ঘুমের চোখে উঠে খাবে, স্বাদ বুঝবে না, কাল হয়তো আপনাকে রান্নার নিন্দেই শুনতে হবে।'

'বেশ তো, আপনি জেগে আছেন, একটু চেখে স্বাদ বুঝে রাখুন, সাক্ষী থাকবেন।'

'অর্থাৎ আমার জন্যেও এসেছে,' হেসে হাত বাড়িয়ে বাটিটা নিলাম। 'পারতাম খেতে খুব এককালে মাংস— এখনো, এখনো পারি এমন—'

'না-পারার আছে কি,' অন্ধকারে আর-এক ঝলক হাসি উঠলো। 'দাঁত ক'টি সকালে নড়বে ব'লে তো মনে হয় না।'

মনে পড়লো, সন্ধ্যাবেলা সামনে যখন দাঁড়িয়েছিলাম ধারালো চকচকে চোখে ও আমার দাঁতগুলির দিকেও দু-বার তাকিয়েছিলো।

'আপনার তো খাওয়া হয়নি।'

'এইবার খাবো, নাকি রাত দুপুর অবধি আমিও জেগে ব'সে থাকবো খাবার সামনে নিয়ে? চললাম—'

হাসলো ও, যেন তারের যন্ত্রে ছড় টেনে গেলো।

মাথার ভিতর ঝিম্‌ঝিম্‌ করছিলো। না, এ আমাকেই দেওয়া, আমাকেই দিতে আসা। আমার ঘর রাত আটটা থেকে নিভে গেছে, ঘুমে তলিয়ে আছে, পাঁচ-সাত হাত দূরে আর-এক ঘরে ব'সে ওর টের না পাওয়া খামোকা কথা।

মনে-মনে হাসলাম। কেননা একটা ছবি তখন আবার মনে এসে গেছে। টিংটিং ক'রে রাস্তায়-রাস্তায় ঘুরছে পেণ্টুলন-পরা সেই মূর্তি। বন্ধুর আড্ডা ছেড়ে আর-এক বন্ধুর আড্ডায়। সিগারেটের ধোঁয়া হ'য়ে চিরকাল তুমি উড়তে থাকো, ভেসে যাও, বললাম মনে-মনে।

সোজা চ'লে গেলাম নিচে কলতলায়। জায়গাটা এখন সর্বজন-পরিত্যক্ত। নিরাপদ।

না, প্রীতি বীথিকে অর্থাৎ হেমলতার সংসারকে আর নাড়া দিলাম না এই ভেবে, ওদের মন পরিষ্কার নেই। বিশেষ ক'রে বুড়ি মেয়ে দুটো। আমি মহিলার সঙ্গে কথাবার্তা বলি ওটা যেন ওরা পছন্দ করে না এমন ভাব। না হ'লে সকালে আমার অফিসে যাওয়া নিয়ে বীথির অত মাথাব্যথা উঠেছিলো কেন? সন্ধ্যাবেলা আমি ঘরে না ফেরা তক প্রীতি অন্ধকার চৌকাঠে দাঁড়িয়ে ছিলো কেন? এখন এই মাংসের ব্যাপারটাও ভালো চোখে দেখবে না। দেখতে পারে না কুটিল যাদের মন।

চৌবাচ্চার পাশে দাঁড়িয়ে গরম উপাদেয় মাংসখণ্ডগুলি একে-একে সব সাবাড় ক'রে বাটিটা জলে ভিজিয়ে রেখে মুখ-হাত ধুয়ে ওপরে উঠে এলাম। এসে আবার আগের জায়গায় রেলিং ধ'রে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলাম।

এবার পরিষ্কার চোখে পড়লো, জানলার ওপারে, টেবিলের ওপর থালা রেখে লীলাময়ী খেতে বসেছে। দেখলাম অনেকক্ষণ ধ'রে ওর ধীরেসুস্থে চিবিয়ে রসিয়ে খাওয়া, তারপর হাত-মুখ ধোওয়া, মুখ মোছা, পান খাওয়া, আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে পানের রসে রাঙানো ঠোঁট উল্টে-পাল্টে দেখা। আঁচলটা কাঁধ থেকে প'ড়ে গেছে। আলস্যে মন্থর। একদিকের দেযাল থেকে লীলাময়ী অন্য দেয়ালে চোখ ফেরালো, এলো একেবারে জানলার কাছে। জানি না রেলিং ঘেঁষে দাঁড়ানো আমার আবছা মূর্তি ওর চোখে পড়েছিলো কিনা, ঈশ্বর জানে, তবে আমি তো দেখলাম অন্ধকারে চোখ রেখে ও ব্লাউজের হুক্ খুললো।

অবশ্য একটু পরেই আলো নিভলো। আমার দু-কান দিয়ে তখন গরম হাওয়া বইছে। যেন কান পেতে শুনতে পেলাম মঙ্গলগ্রহের অন্ধকার গুহায় যৌবনতপ্ত শরীরের এ-পাশ থেকে ও-পাশ ফেরার শব্দ।

আস্তে-আস্তে ঘরে এসে শুয়ে পড়লাম। সেই পেণ্টুলন-পরা আদমী রাতের কোন ভূতুড়ে প্রহরে ঘর নিয়েছিলো জেগে ব'সে থেকে দেখবার আমার দরকার ছিলো না। আমাদের মধ্যে ও ছিলো না।

সকালে বড়ো একটা নিমের ডাল নিয়ে দন্তধাবনে ব্যস্ত ছিলাম। একটা-কিছু না ক'রে এতক্ষণ বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকি বা কি ক'রে। তবু বীথি, কুবুদ্ধির হাঁড়ি, দু-বার দরজায় এসে উঁকি দিয়ে গেছে। দেখুক। আমার বারান্দায় আমি দাঁড়িয়ে আছি এ তো আর কেউ অস্বীকার করবে না। অটল ও অনড় হ'য়ে আমি ওধারে দরজার গায়ে হলদে রোদের পরিধিটা মনে-মনে জরিপ ক'রে চললাম। যেন আজ আরো বেশি বেলা হচ্ছে। ঘুম আর ভাঙে না।

এক-সময়ে দরজা ন'ড়ে উঠলো। ইতস্তত করছিলাম নিমের ডালটা মুখ থেকে নামিয়ে নেবো কিনা, তার আগেই দরজা ফাঁক হ'লো।

বেরোলো, সে নয়, টাই-স্যুট-পরা তালপাতার সেপাইটি।

বিরক্ত হ'য়ে মুখ ফিরিয়ে নিই। এতৎসত্ত্বেও ছোঁড়া আমার দিকেই এগিয়ে এলো। হাসি-হাসি চেহারা।

'দয়া ক'রে একটা রিক্শা ডেকে দিন না।'

নিমের তিক্তরসমিশ্রিত একটা ঢোক গিললাম। রইলাম চুপ ক'রে।

'আপনি কুলদাবাবু?'

'কুলদারঞ্জন পাইন,' মুখ খুলতে হ'লো এবার, 'পার্কার অ্যাণ্ড পার্কার কোম্পানীর সিনিয়র গ্রেড ক্লার্ক। এ-বাড়িতে আমি সতেরো বছর।' ভাবলাম, পাটনায় তুমি ইঞ্জিনিয়ার না লাটসাহেব, এখানে কি।

'তাই বলছিলো ও,' মাথা নেড়ে কাপ্তেন নতুন সিগারেট ধরালো। 'খুব করছেন আমাদের জন্যে, শুনলাম।'

মনটা একটু নরম হ'লো।

'না, খুব আর কি,' বললাম, 'এক জায়গায় থাকতে গেলে এমন—'

'দ্যাট্স রাইট, ও তাই বলছিলো, আপনি থাকাতে আমাদের অনেক সুবিধে হচ্ছে।'

'আবার বেরোনো হচ্ছে বুঝি?'

'হ্যাঁ, এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে হবে, ইফ্ ইউ ডোণ্ট্ মাইণ্ড্, দয়া ক'রে একটা রিক্শা ডেকে দিন না।'

'ও আবার একটা কাজ নাকি।' রাগটা একদম চ'লে গেছে তখন আমার। 'আমি এখুনি ডেকে দিচ্ছি।'

'ছুটিতে এলাম, ওদের সবাইর সঙ্গে দেখা না-করাটা কি ভালো?'

'সে তো ঠিকই, কেন দেখা করবেন না। না-করার আছে কি।' হৃষ্টমনে নিচে গিয়ে রিক্শা ডেকে আনি। 'বন্ধুবান্ধব নিয়েই তো সংসার, এ-দিনে ক'টা লোক হ'তে পারে বন্ধুবৎসল।' পর্যন্ত দুটো উপদেশও দিলাম।

তারপর ঠুন্‌ঠুন্‌ ক'রে রিক্‌শার তো ঘণ্টা বাজলো না, আমার বুকের ভিতর ঘণ্টা বাজতে লাগলো।

শিস দিতে-দিতে ওপরে উঠছিলাম ডবল সিঁড়ি ডিঙিয়ে, যেন বুকের একটা ভার নেমে গেছে। কিন্তু মনের এই প্রফুল্ল ভাব নষ্ট ক'রে দিলে ধুম্‌সি মেয়েটা। সিঁড়ির মুখ আগলে দাঁড়িয়ে আছে প্রীতি। যেন গোরু চরাতে এসেছে।

'তোমার বেলা হ'য়ে গেলো, বাবা।'

'তুই আমার অফিস করবি নাকি?' রাগে রুখে উঠলাম এবং আরো কি বলতে গেছি, দেখি, ঘন সবুজ রঙের একটা টুথব্রাশ-হাতে সিঁড়ির মুখে লীলাময়ী। ঘুম-ভাঙা ফোলা-ফোলা চোখ।

ভয় হ'লো রাত্রের মাংসের কথাটা না তোলে হঠাৎ।

কিন্তু লীলাময়ী চালাক মেয়ে। সেয়ানা।

যেন কাল বিকেলের পর এই আমার সঙ্গে দেখা।

'আজ আবার আপনাকে একটু কষ্ট দেবো।' কত যেন দ্বিধাগ্রস্ত চেহারা। দাঁড়ালো প্রীতির ঠিক পেছনে।

'কষ্ট আর কি,' বললাম, 'এক-জায়গায় থাকতে গেলে এমন—'

'এ-বেলা পারবেন না। সময় নেই আপনার। ও-বেলা অফিস থেকে ফেরার সময়—'

'বলুন-না কি করতে হবে,'— যেন সংকুচিত আমিও, সন্ত্রস্ত। চোরা চোখে দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়ানো প্রীতির চোখ দুটো দেখে নিলাম। 'কিছু আনতে হবে বুঝি?'

'ইলিশ মাছ, গঙ্গার ইলিশ পান তো।' লীলাময়ী আমার চোখে তাকালো। পরে চোখ ফিরিয়ে নিলো।

'ও আবার কষ্ট কি।' হেসে লীলাময়ীর মুখের দিকে তাকালাম।

লাল-রঙা ডবল নোট দুটো আলগোছে আমার হাতে ছেড়ে দিয়ে যুবতী ধীর মন্থর পায়ে দাঁত ঘষতে-ঘষতে প্যাসেজের দিকে চ'লে গেলো।'

একটা ক্রুদ্ধ জলন্ত দৃষ্টি প্রীতির মুখের ওপর ছুঁড়ে আমিও ঘরে চ'লে এলাম।

যেন স্বতন্ত্র সম্পূর্ণ আলাদা আমি এই গোষ্ঠী থেকে। মণ্টু ফণ্টু একসঙ্গে খেতে বসেছে, একবার ওদের মুখের দিকেও তাকাইনি। যদি-বা এক-আধবার চোখে পড়েছে, মনে হয়েছে দুঃখে দারিদ্র্যে অভাবে জমাট এক-একটি শিলাখণ্ড আমার রাস্তা জুড়ে আছে। এ-বেলা পরিবেশন করলো বীথি। রান্না করেছে নিশ্চয় বুড়ি মেয়েটা। যত বয়েস হচ্ছে মাথায় বদ্‌চিন্তা কুট্‌কুট্‌ করছে। রান্না! আর রাত্রে এতটা ঘি গরম-মশলার মাংস খেয়ে চিংড়ি ছাঁচি-কুমড়োর তরকারি জিহ্বায় কেমন লাগবে কল্পনা করুন। আর ঘরময় হেমলতার গাত্রোত্থিত মালিশের উগ্র ঝাঁজালো গন্ধ। যেন উনিশ বছর এই গন্ধটা ছড়িয়ে হেমলতা আমার পরমায়ুকে জীর্ণতর করবার জন্যে বেঁচে আছে। কোনোমতে খাওয়া শেষ ক'রে জামা চড়িয়ে বেরিয়ে পড়লাম।

অফিসে পৌঁছে, আমার যা প্রথম কাজ, ডেস্প্যাচের অনঙ্গ ধরকে আড়ালে ডেকে নিলাম।

'শঙ্খিনী নারীর লক্ষণ কি, ভায়া?'

'গোপন-স্বভাবা, কিন্তু তেজস্বিনী।'

চুপ ক'রে জায়গায় এসে বসলাম। এ-সব ব্যাপারে অনঙ্গ ধরের পরামর্শ মেনে চলি আমরা, বয়স্করা। নারীচরিত্র ওর নখাগ্রে। এক বিয়ে করেছিলো লোকটা আইন মতো, আরেক বিয়ে সেদিন ক'রে এসেছে আইন ভেঙে, এ-বয়সে। সাহস যেমন, জানেও অনেক। সুতরাং উঠতে-বসতে এ-সব ব্যাপারে আমরা অফিসের তথাকথিত বুড়ো যারা অনঙ্গর

মতামতের সঙ্গে লক্ষণ-বিলক্ষণগুলো মিলিয়ে দেখি। চেষ্টা করি সে-ভাবে চলার। নইলে তো এখনকার ছেলে-ছোকরাদের মতো ট্র্যামে-পার্কে-ময়দানে-রাস্তায় ঘুরতে হ'তো মায়াবিনী হরিণীর খুরের ধুলো খেয়ে।

এখনকার ওরা জানে না অন্দরের অন্ধকারেও সুন্দর জন্তু থাকে খেলার— খেলবার। কোথায় সেই স্থৈর্য, সে আবিষ্কার।

লেজার আড়াল ক'রে সারাদিন ব'সে মাথা খাটালাম, চিন্তা করলাম। পাঁচটা বাজতে রাস্তায় নেমে সোজা গঙ্গার ঘাটে।

একটা-একটা ক'রে সতেরোটা মাছ উল্টে-পাল্টে দেখে শেষে বেশ চকচকে চ্যাপ্টা মনের মতোন ইলিশ বেছে নিয়ে দাম চুকিয়ে বাড়ির দিকে চললাম। ইচ্ছা ক'রেই রাস্তায় সন্ধ্যা করলাম।

গলির মুখে এসে মাছটা বাঁ-হাত থেকে ডান হাতে নিলাম। কেননা আমাদের ঘর বারান্দার বাঁয়ে, অর্থাৎ তুমি যদি প্যাসেজ ধ'রে পার্টিশনের দিকে যাও যে-কেউ দেখবে হাতে মাছ। কিন্তু তবু সিঁড়ির মুখে মণ্টুটা দেখে ফেললো। আবছা অন্ধকারেও টের পেলো মাছ। কিছু বললে না, কেবল হাঁ ক'রে চেয়ে রইলো, যেন ওর বিশ্বাসই হয়নি এতবড়ো ইলিশ বাবা ঘরে আনবে।

দেখলে বীথি, চৌবাচ্চার দিকে যাচ্ছিলো ও।

প্রীতি। কালকের মতো চৌকাঠে দাঁড়িয়ে ঠিক চোখ মেলে চেয়ে ছিলো। এবং সবগুলো চোখকে উপেক্ষা ক'রে, যেন আমি কাউকে দেখিনি, সোজা চ'লে গেলাম ঘাড় গুঁজে প্যাসেজের ওধারে।

কড়া নাড়তে ঘর-দুয়ার লাল আলোয় টল্‌টল্‌ ক'রে উঠলো। এই সবে আলো জ্বললো। বেরিয়ে এলো লীলাময়ী। ফোলা-ফোলা চোখ। যেন অবেলায় অনেক ঘুমিয়ে উঠেছে। খোঁপা ভেঙে ছড়িয়ে পড়েছে খোলা পিঠে। আঁচলের আধখানা মাটিতে লুটোয়।

'দাঁড়িয়ে কেন, আসুন।'

ইতস্তত করলাম, পিছনের দিকে তাকাই একবার।

'বাঘ, বাঘের খাঁচা এটা!' ধমক দিয়ে লীলাময়ী হাসলো। ফুলের পাপড়ি ছিটকে পড়লো চারিদিকে। ওর হাসির আড়ালে কালো চোখের তারায় দেখলাম স্বচ্ছ নীল স্ফুলিঙ্গ। এক-মুহূর্তের জন্যে।

নিঃশব্দে চৌকাঠ পার হ'য়ে আমাকে ভিতরে যেতে হ'লো। ছোট্টো উঠোন। চুপচাপ।

এক হাতে আঁচল গুটোতে-গুটোতে অন্য হাতে সদরের ছিটকিনি তুলে দিয়ে ও ঘুরে দাঁড়ালো। হাসলো আবার। নিশ্চিত নির্ভয়। এখন আমরা বাইরের জগত থেকে বিচ্ছিন্ন। বুকের ভিতর ঢুবঢুব করছে আমার।

'কি করবো বলুন,' বললাম আস্তে-আস্তে। যেন ওর হাতের পুত্তলি আমি, নির্দেশ মেনে চলবো। 'কোথায় রাখবো মাছ?'

'রাখুন ওখানে।' আঙুল দিয়ে নর্দমার ধারটা দেখিয়ে যুবতী ফের মিটিমিটি হাসলো। 'যেন আপনাকে হুকুম করছি, তাই আবার ভাবছেন না তো?' ব'লে চোখ টিপলো।

'হুকুম করতে জানেন ব'লেই তো করছেন।' মাছটা নামিয়ে রেখে ওর মুখের দিকে তাকালাম। রসে কৌতুকে আয়ত ঢলঢল চোখ। ভাবলাম, তোমার হুকুম জন্মে-জন্মে মানতে রাজী।

'তাই নাকি। দাঁড়ান, আমি আসছি।'

দীর্ঘ ফর্সা দেহ, সম্রাজ্ঞীর মতো। দু-হাতে খোঁপা ঠিক করতে-করতে ঘরে গিয়ে ঢুকলো।

এলো থালা আর বঁটি নিয়ে।

'ও, আমার সামনে রেখে মাছ কুটবেন বুঝি?'

'দেখবো না ভালো কি মন্দ, টাটকা না পচা ?' কুটিল আঁকা-বাঁকা হাসি ঠোঁটের কিনারায়। যেন এখন পর্যন্ত সহজ হ'তে পারছে না এমন ভাব। শঙ্খিনী।

'দেখুন।' ঠোঁট টিপে হাসলাম। 'অনেক ঘুরে দেখে-শুনে এনেছি।'

'তাই বুঝি এত রাত হ'লো ?' কুটিলতর চোখে হাসলো ভ্রূবিলাসিনী। এমন চালাক, এমন চাপা। ঠাট ক'রে কোমরে আঁচল জড়িয়ে বঁটি বিছিয়ে বসলো। কান গরম হ'য়ে গেছে আমার। মাথা ঝিম্‌ঝিম্‌ করছে। বুঝি আশা আশঙ্কা ভয় ও লোভ একসঙ্গে আমার চোখে ফুটে উঠেছে তখন। আমি পুরুষ। কিন্তু ওরা পারে মনের ভাব অনেকক্ষণ গোপন রাখতে। ঘুরিয়ে-পেঁচিয়ে কথা। লীলাময়ী ঝপ্‌ ক'রে তখন কিনা অন্য প্রসঙ্গে চ'লে গেছে।

'আপনার স্ত্রী উঠে দাঁড়াতে পারে না ?'

'একেবারে অচল।' দীর্ঘশ্বাস ফেললাম, অবশ্য অন্য কারণে। ওর হাতের মাছ দু-খণ্ড হ'য়ে বঁটির বুক থেকে থালায় নেমে এলো। তাজা লাল রক্ত। উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠলাম।

'দেখুন কেমন টাটকা ইলিশ।' বলতে গিয়ে হঠাৎ চুপ করলাম। রক্তের একটা ফোঁটা ছিটকে ওর গালে পড়েছে, নাকের পাশে। হাতের পিঠ দিয়ে ও তাই মুছতে চেষ্টা করছে বার-বার।

'আরেকটু নিচে।' রুদ্ধশ্বাসে বললাম।

কিন্তু এবারও ঠিক জায়গায় হাত পৌঁছলো না।

'হ'লো না,' বললাম, 'আরো ওপরে।'

'দিন-না মুছে।' কাতর চোখে ও আমার দিকে তাকালো। হাত জোড়া, পারছে না নিজে। মনে হ'লো গালে ওর রক্তবর্ণ একটা তিল। হাত কাঁপছিলো আমার, ঘন-ঘন নিশ্বাস পড়ছে। নুয়ে কাপড়ের খুঁট দিয়ে রক্তের দাগ মুছে দিলাম।

কিন্তু আশ্চর্য লীলাময়ী। অটল অটুট। যেন কিছুই হয়নি, যেন এই স্বাভাবিক। বললো, 'দাঁড়িয়ে কেন, বসুন, গল্প করুন, আমি মাছ কুটে শেষ করি।'

'ততক্ষণে উনুনের কাঠ ক'খানা তো কাটিয়ে নিতে পারো ওকে দিয়ে।' ঘরের ভিতর থেকে শব্দ এলো, ইঞ্জিনিয়ারের গলা, শুয়ে আছে যেন।

আমার চোখে চোখ চেয়ে লীলাময়ী মিটিমিটি হাসছে।

'এ-বেলা বেরোতে পারেনি, মানিব্যাগ লুকিয়ে রেখেছিলাম, শুনুন কেমন পাকা সংসারীর মতো কথা বলছে এখন।' পরে মুখ ফিরিয়ে ঘরের দিকে চেয়ে গলা বড়ো ক'রে বললো, 'তা উনি কেটে দেবেন, তুমি চুপচাপ শুয়ে থাকো, কুলদাবাবুকে দিয়ে তোমার জন্য নিচে থেকে একটিন সিগারেটও আনিয়ে রাখবো ভেবেছি।'

মঙ্গলগ্রহের লাল শক্ত সিমেণ্টের ওপর চোখ রেখে কথাগুলি শুনছি আমি।

////////////////////////////////////

দৃষ্টি

////////////////////////////////////

এমন আর হয়নি কোনোদিন। চা-এর সঙ্গে আটার রুটি, দু-চার পয়সার তেলেভাজা খাবার, কি তেল-নুন-মাখানো মুড়ি চলছিলো আমাদের সকালবেলা। আগে, সেই যুদ্ধের আগে, যখন ঘি সস্তা ছিলো, লুচি কি নিম্‌কি হ'তো মাঝে-মাঝে মনে আছে। চা-এর সঙ্গে গরম নিম্‌কি বাবার খুব প্রিয় ছিলো। আজ শুধু চা দিলাম বাবাকে। হাতল-ভাঙা একটা কাপ। সসার্‌ নেই। ওটা গেছে আমার ছোটো বোন ডলির হাত থেকে প'ড়ে। আর কাপ-এর হাতলটা ভেঙেছি আমি। আমার দোষে গেছে।

তবু তো একটা কাপ কম দিন যায়নি। ন'মাস টিঁকছে।

জানি, এটা ভাঙলে আর নতুন কাপ আসছে না শিগ্‌গির।

মাথা নিচু ক'রে ব'সে ছিলো বাবা। মা যখন চা দিয়ে যায় তখনো মুখ তোলেনি। চা-এর কাপে চুমুক দেবার পর আবার বাবা মেঝের দিকে চেয়ে রইলো দেখলাম।

মা রান্নাঘরে যায়নি। যেতে পারে না। শোবার ঘরে হয়তো আছে। সকাল থেকে একটা কথাও মা-র শুনিনি। ডলি পাটীগণিত সামনে নিয়ে পাশের বাড়ির পাঁচিলের কাক গুনছে এবং দু-বছরের টাট্টু বাবার জুতোজোড়ার মধ্যে পা ঢুকিয়ে বিকট চপচপ আওয়াজ তুলে ঘরের এমাথা-ওমাথা পায়চারি করছে দেখেও মা শব্দ করছে না। সত্যি কেমন অদ্ভুত লাগে।

তবু আমি বাবার সামনে দাঁড়িয়ে ছিলাম। দাঁড়াই।

বাবার খাবার সময় মা কাছে থাকে না ব'লেই যেন মা-র জায়গায় আমাকে দাঁড়াতে হয় আজকাল।

বলতে কি, মা সামনে থাক, বিশেষ ক'রে কোনো-কিছু খেতে দিয়ে, বাবা যেন নিজেও চাইছে না। কেননা, লক্ষ্য করেছি, বাবা তখন একেবারে কিছু খেতে পারে না। বড়ো বেশি আড়ষ্ট নির্জীব হ'য়ে পড়ে। যতটা সম্ভব তাই বাবার কাছে আমিই উপস্থিত থাকি। সে-সময় কিছু জিগ্যেস করতে বাবা আমাকেই করে। করছে।

দ্বিতীয়বার চা-এ চুমুক দিয়ে বাবা আমার দিকে তাকালো।

'আমায় কিছু বলছো, বাবা?' বললাম ঢোক গিলে। কেননা নিজে থেকে বাবা বলবে না কিছু জানা ছিলো।

চেয়ারের হাতলের ওপর হাত রেখে বললাম, 'চা কড়া হ'যে গেছে কি?'

'না, ঠিক আছে।' অল্প হেসে মেঝের দিকে একটুক্ষণ চেয়ে থেকে বাবা শেষে মুখ তুললো। আস্তে-আস্তে যেন পরের বাড়িতে কথা বলছে, আমার চোখে চোখ রেখে বললো, 'একটু চিনি দিতে পারবি?'

আমি চুপ ক'রে রইলাম।

আমার চুপ থাকাতেই বাবা বুঝলো। 'যাক গে, ঠিক আছে।' ব'লে কাপের ওপর ফের মুখ নামালো। একটু পরে, আমি বেশ বুঝলাম, চিনির কথাটা চাপা দেবার জন্যেই বাবা হঠাৎ আমার পায়ের দিকে তাকায়।

'ইস্, কী মাটি জমেছে পায়ে ছাখ্। স্নানের সময় সাবান দিস না, অনু?' চুপ ক'রে রইলাম।

আমি জানি, সাবান না দিয়েও তুই পা-কে কি ক'রে শুধু জলে ওমনি তোয়ালের সাহায্যে রগ্ড়ে ঘ'সে-মেজে ঝকঝকে সুন্দর রাখতে হয়, এই বয়সের আর-দশটি মেয়ে কি ক'রে পা সুন্দর রাখছে। ষোলো বছরের

মেয়ের পায়ে ময়লা জমে না। তাই বাবার এই কথা প্রসঙ্গান্তরের কথা, টের পেতে বিলম্ব হ'লো না।

কিন্তু আশ্চর্য, সেই প্রসঙ্গেরও জবাব মিললো। জবাব দিলে মা। আমি যখন চুপ ক'রে ছিলাম পাশের ঘরে শোনা গেলো স্পষ্ট দীর্ঘশ্বাস।

বাবা এই বিষয়ে আর অগ্রসর হ'লো না। চুপ করলো। কিন্তু কতক্ষণ, এই সবে সকাল, দিনের মোটে শুরু। এখনই ডলি ও টাটু ছুটে আসবে মা-র কাছে, 'খেতে দাও, মা।' চিৎকার করবে ওরা। কান্নাকাটি করবে।

তখন। তখনকার ঘরের চেহারা কি হবে। কি ভাবে উত্তর দেবে মা পাশের ঘরে, আর তার ধাক্কা এসে এ-ঘরে লাগবে কেমন! সে-কথা, সেই ছবি আমি ভাবছিলাম। অর্থাৎ বাবার চেহারা মনে-মনে আঁকছিলাম। তার পাশে দাঁড়িয়ে।

আমি জানি বাবা তখন চুপ ক'রে তাকাবে আমার দিকেই।

সন্তানের দিকে এই তাকানো—স্নেহ-দৃষ্টি নয়, স্নেহ-প্রত্যাশার চাউনি। বাপ মেয়ের কাছে স্নেহ খুঁজছে, সান্ত্বনা চাইছে, আশ্রয়।

কেননা, বাবার খাওয়ার সময় মা স'রে থাকতে পারে, ডলি ও টাটুর যখন খাওয়ার সময় উপস্থিত হয়, তখন মা চুপ ক'রে সে-ঘরে শুয়ে থাকতে পারে না, ছুটে আসে এখানে, বাবার সামনে। আসবেই।

'তুমি যদি চাকরি জোগাড় করতে না পারো, বলো, আমি যাই, আমায় যেতে দাও, রোজগার করি। ওরা অন্তত পেট ভ'রে খেয়ে বাঁচুক। না পরুক, না লেখাপড়া শিখুক আমার দুঃখ নেই, তবু তো—' মা দেয়ালের দিকে চোখ ফেরাবে, বাবা মুখ তুলছে না দেখে দেয়ালকে লক্ষ্য ক'রেই কথাগুলি বলবে, অর্থাৎ দেয়ালের গায়ে ছুঁড়ে-ছুঁড়ে মারবে কথার শাবল। হ্যাঁ, একবার আরম্ভ করলে মাকে থামানো মুশকিল। 'তুমি

চুপ ক'রে আছো, থাকতে পারছো। আমি এখন ওদের কি উত্তর দিই, কি বোঝাই! না সন্তান বাঁচিয়ে রাখার দায়িত্ব একলা আমার?' ব'লে জলন্ত দৃষ্টি বাবার আনত ঘাড়ের ওপর রেখে মা ঘন-ঘন নিশ্বাস ফেলবে।

তথাপি বাবা নিরুত্তর থাকবে।

চাল কয়লা তেল, এমন কি হলুদ লঙ্কা বলতেও ঘরে আজ আর কিছু নেই। আমি জানি। কাল বিকেলে সব ফুরিয়েছে। তারও আগে। সেই দুপুরে। রাত্রে আড়াইখানা ক'রে আটার রুটি আর জলের মতো পাতলা একটু বিউলির ডাল তো হয়েছিলো।

আজ? তা-ও সকাল পার না হ'তে আমি দুধ চিনি দেশলাইয়ের কাঠি ইত্যাদি ধার ক'রে ফেলেছি। না-হ'লে বাবার অন্তত একবারেরও চা-হয় না।

আগুনের সঙ্গে এইখানেই আজ সম্পর্ক শেষ। কাগজ জ্বেলে কোনো-রকমে এক কাপ চায়ের জল ফুটিয়ে নামানো। উনুনে আগুন দেয়া হয়নি।

'দুটো টাকা ধার ক'রে এনেছো শুনতাম যদি!' মা মুখ ঘুরিয়ে বলবে, 'সব দিকেই যোগ্য তুমি। ট্র্যাম-বাসের তলে ছ-আনার পয়সা কাল জলে গেছে। বলছিলাম বিকেলে অনিকে। কেমন বলিনি তোকে, অনু?'

অর্থাৎ কাল আবার চাকরির চেষ্টায় গেছে বাবা টালিগঞ্জে কার কাছে। কিছুই হয়নি। ফিরে এসেছে। অনেক রাত্রে ফিরেছিলো বাবা আমি টের পেয়েছি। পয়সার কথাটা কাল বিকেলে মা বলেছিলো।

'ছ-আনা পয়সা ওমনি নষ্ট না হ'লে, আমি ওদের— বাচ্চা দুটোকে অন্তত কিছু মুড়ি খাবার কিনে দিতে পারতাম। খামোকা পয়সা নষ্ট করবে তুমি আমি কি জানি না।' ব'লে মা আমার দিকে তাকাতে চেষ্টা করবে হয়তো তখন। হলামই-বা সকলের বড়ো সন্তান। খাওয়া-সম্পর্কে আমার কথার উল্লেখ হ'লো না দেখে সত্যি দুঃখ করছি কিনা তা দেখবার

জন্যে মা-র মনে কৌতূহল হওয়া কি স্বাভাবিক নয়? কিন্তু আমি জানি, মা চোখ ফেরাবার আগে আমার মুখের দিকে চেয়ে আছে আর-এক-জোড়া নির্জীব অসহায় লজ্জিত বিষন্ন চোখ। 'তুই একবার তোর মাকে থামতে বল, অমু। আমি যে পারছি না। সারাদিনের সম্বল আমায় একটু চা খেতেও দেবে না ও।' যেন বলছে বাবা।

'তুমি যাও মা ঘরে।' বলবো, বলতে হবে তখন আমাকে। 'দেখি না চেষ্টা ক'রে গোটা-দুই টাকা ধার যদি পাই কারো কাছে।'

জানি, মা গম্ভীর হ'য়ে বেরিয়ে যাবে তৎক্ষণাৎ।

আর মেঝের দিকে তাকিয়ে বাবা ছোট্টো একটা নিশ্বাস ফেলবে। এবং বারান্দার চৌকাঠ পার হ'য়ে আমি যখন ওপরের ফ্ল্যাটগুলিতে উঠবার সিঁড়ি ধরছি, তখন পিছন থেকে— ঘাড় না ঘুরিয়েও দেখতে পাবো, কৃতজ্ঞ সজল চোখে বাবা আমার দিকে চেয়ে আছে।

কিন্তু আমি জানি, ওপরে কারো কাছে টাকা ধার পাবো না। কেবল মাকে থামাবার জন্য ধারের কথা বলা, কে দেবে আমাকে টাকা কর্জ। কেননা, আমরা যে কিছু না, আমাদের হ'য়ে এসেছে, এটা অনুমান করতে ওপরের কোনো গৃহিণীর বাকি আছে কি। রোজ আমাকে এটা-ওটা চাইতে হচ্ছে, এ-ঘরে ও-ঘরে। চিনি থেকে চাল, দেশলাইয়ের কাঠি থেকে কয়লা। এ থেকে সব বুঝতে পারছে। সবাই টের পায়।

ন-মাস বাবার চাকরি নেই। সেই যে ব্যাঙ্ক ফেল প'ড়ে কাজটি গেছে আর জুটছে না। কোনোরকমেই জোটাতে পারছে না একটি কোথাও।

সতেরো জায়গা থেকে ইণ্টারভিউ এসেছিলো। সতেরো জায়গা থেকে বিফল মনোরথ হ'য়ে ফিরেছে বাবা। মা বলছে, 'ওরা যোগ্য লোক নিয়েছে, তার অর্থ তোমার চেয়ে যোগ্য লোক পেয়েছে। তোমার চেয়ে যোগ্য সবাই। সর্বত্র।'

মা আরো বলবে, 'আমি তখনই জানি। বলেছিলাম অনিকে, কেমন বলিনি তোকে, অনু ?' ছলছল চোখে ডলি ও টাট্টুর দিকে তাকিয়ে মা সর্বদা বলছে এ-কথা, 'বাচ্চা দুটো যে চোখের সামনে না খেয়ে মরবে, সেই দুঃখ।'

'চালাক-চতুর হ'তে হয় সংসারে।' কথার শেষে দীর্ঘশ্বাস ফেলে মা। 'চটপটে হ'তে হয়, চোখেমুখে কথা না ফুটলে মানুষ বুঝবে কি ক'রে তুমি একটি এম. এ. পাস মহাবিদ্বান। আর তাতেই বা হ'লো কি। সেই তো পঁচাত্তর টাকায় ব্যাঙ্কের চাকরিতে ঢুকেছিলে, আজ তিন সন্তানের বাপ হ'য়ে দু-শ' টাকায় এসে গড়াগড়ি দিচ্ছো, দিচ্ছিলে। হচ্ছিলোই-বা কি।' মা এখনো এক-এক সময় ভুলে যায় বাবার আজ চাকরিই নেই।

অর্থাৎ বাবা যে সংসারে কোনো কাজের না, হাবাগোবা ভালোমানুষ হ'য়ে সংসারটা একেবারে ভোঁতা ক'রে রেখেছে সেই দুঃখ উথলে উঠেছে মা-র মনে তখন। কবে কোন এক বড়ো মার্চেন্ট অফিসে সুযোগ পেয়ে বাবা যায়নি। স্যুট পরতে হবে ভয়ে যে যায়নি বা সেটা একটা বিলিতি প্রতিষ্ঠান, ব্যাঙ্ক বাঙালির— বাঙালি-প্রতিষ্ঠানে চিরজীবন আঁকড়ে থাকবো এই আদর্শবোধে কি ? 'আসলে ও ভয় পায়, আমার কথা কি বুঝলি অনু—' মা বাবার সামনেও আমাকে বোঝায়, 'সাহেব-সুবোর সঙ্গে কথা বলতেই উনি ভয় পাচ্ছেন, চোখেমুখে কথা কইতে হয় সেখানে, টিপটাপ চলতে হয়, ফিটফাট না থাকলে চাকরি যায়, চাকরি যাবে ভয়ে শ্যাওলা-ধরা পচা এক ব্যাঙ্কের চাকরি ছাড়ছে না— উত্থানপতন শূন্য হ'য়ে যেখানে দলা পাকিয়ে শুয়ে আছে সেখানেই থাকছে। তা-ও যদি ভালো ব্যাঙ্ক হ'তো।'

এ-সব কথা বাবা আগেও শুনতো। তখনো হাসতো, আর আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতো। আমার দিকে আজ যেমন তাকায় বাবা

সেদিনও তাকিয়েছে। অর্থাৎ মা-র মনে যে সন্তোষ নেই, আরো বেশি উপায় করবার মতো সাহস, বুদ্ধি, বিচক্ষণতা, আগ্রহ ও উত্তাপ -হীন হ'য়ে ঠাণ্ডা ভালোমানুষ সেজে অফিসের ছুটির পর দিব্যি ঘরে এসে বাবা মেয়েকে গ্রামার পড়া শেখাচ্ছে, মা-র চোখে তার ক্ষমা ছিলো না। 'এই স্নেহ-যত্নের, এই আতিশয্যের দাম কি যার ঘরে টাকা নেই।' বলতো মা তখনই।

আর, মুখে হাসি ও চোখে বেদনা নিয়ে বাবা আমার মুখের দিকে চেয়ে চুপ ক'রে থাকতো।

আমি বলতাম, 'তুমি এখন যাও মা, আমি পড়ছি।' মা-র মুখ বন্ধ করতে সেদিনও আমায় কথা বলতে হয়েছে। বাবা আমার আশ্রয়ই নিয়েছিলো।

তবু তো সেদিন রান্না বন্ধ ছিলো না। যদিও রেডিও ছিলো না ঘরে, ইলেক্‌ট্রিক ফ্যান, কি মা-র ও আমার দামি-দামি আট-দশখানা ক'রে জমকালো শাড়ি।

অজস্র না থাকলেও অভাব তেমন ছিলো না সত্য।

চলছিলো সংসার টুক্‌টুক্‌ ক'রে।

তাই বলছি, ধার করতে যে এখন ওপরে যাবো, রেণুর মা, পলাশের মা, মৃদুলাদি, মায়া ওরা ভাবছে কি আমাদের সম্পর্কে।

অথচ ওরাও কেউ বড়োলোক নয়। এবং এই সাহস ক'রেই প্রথম-প্রথম তেল নুন কি লঙ্কা চিনি সব ধার করেছি। যেতাম, যেন ভাবতাম মনে-মনে, অভাব তো ওদেরও একদিন হ'তে পারে। আসবে আমাদের কাছে। আসুক। যেন এমন একটা গোপন ইচ্ছা পোষণ করতাম কারো দরজায় দাঁড়িয়ে যখনই কিছু চেয়েছি।

সত্যি, ন-মাস বাবার চাকরি থাকবে না এ-কথা কে জানতো। ন-মাসে

বাবার চেহারা কি হবে, বা কেমন হবে মা-র মেজাজ, আমি সে-কথা বলছি না, বলছি আমাদের দেখে বাইরের লোকের চেহারা কেমন হচ্ছে। তার চেয়ে বেশি আমায় দেখে। আমাকেই ওরা দেখছে বেশি। প্রায় রোজ একবার দু-বার আমাকে ওপরে যেতে হচ্ছে। কাল এক-টুকরো কাপড়-কাচা-সাবান ধার করতে যেতে হয়েছিলো উত্তরের ব্লকে পলাশের মা-র কাছে।

অথচ মনে আছে, বাবার চাকরি ছিলো যেদিন সেদিকে আমি বড়ো-একটা পা বাড়াইনি। তার কারণ ওরা আমাদের চেয়ে গরিব। আগে নিজেদের সঙ্গে তুলনা করলে পলাশদের কত ছোটো মনে হ'তো। স্কুল-মাস্টার বাপ। আমার বাবা যা মাইনে পাচ্ছিলো তার অর্ধেক রোজগার করেন পলাশের বাবা। আমার চেয়ে পলাশের ভাই-বোনও সংখ্যায় বেশি।

আগে ওদের দেখে ভাবতাম খুব কষ্টে সংসার চলছে। এখন আমাদের দেখে, কষ্টে নয় আদৌ কি ক'রে চলছে তা-ই ওরা ভাবছে। স্বাভাবিক। আমি দরজায় গেলে ওরা কথা কইতে আসে, হাসে। এবং আমি যে চাইতে গেছি তা ওরা প্রথম বুঝতে চায় না। বুঝতে দেয়নি এক টুকরো কাপড়-কাচা-সাবানের অভাব হয়েছিলো আমার।

এ যেন মর্মান্তিকভাবে নিষ্ঠুর হওয়া। প্রতিবেশী দরিদ্র হ'লে প্রতিবেশীরা তাই করে। তিনবার বলার পর তবে বিশ্বাস করলো। হঠাৎ বেশ হেসে প্রশ্ন করলো পলাশের মা, 'হ্যাঁরে অনু, তুই ইস্কুলে যাস্ নে আর শুনছি। বিয়ের আয়োজন চলছে বুঝি ?' চুপ ক'রে গিয়েছিলাম।

বুঝতে কষ্ট হয়নি, সরাসরি আমার মুখ থেকে জানতে চেয়েছিলো মহিলা, আমার পড়া বন্ধ হয়েছে। মাইনে দিইনি, স্কুলে নাম কাটা গেছে। পলাশ আর আমি একসঙ্গে পড়ছিলাম কিনা। জানতে পেরে পলাশের

মা বেশ চঞ্চল হ'য়ে উঠেছে। একটা সংসার চলতে-চলতে হঠাৎ থেমে গেলে আশেপাশের সবাই চঞ্চল হয়, উৎসুক চোখে তাকিয়ে থাকে।

কাল রেণুর মা-র কাছে গিয়েছিলাম তিনবার। গৃহস্থের অত্যাবশ্যক তিনটি সামগ্রী অর্থাৎ তেল নুন ও কয়লা ধার করতে যেতে হয়েছিলো।

আশ্চর্য, তাতেও মহিলা বিচলিত হননি।

হঠাৎ তিনি আমার গায়ে হাত রেখে ব্লাউজের গলার ভিতর রীতিমতো হাত ঢুকিয়ে নেক্‌লেসটা টেনে বার করলেন।

তারপর হেসে উঠলেন। 'আমি আরো ভাবছিলাম নতুন হার গড়িয়েছিস বুঝি।' ব'লে হার থেকে হাত গুটিয়ে নিলেন মহিলা।

চুপ ক'রে রইলাম।

অর্থাৎ আমারটা যে যায়নি এখনো, কেন যায়নি, কবে যাচ্ছে, মুখ দিয়ে ঠিক খবরটা বেরোয় কিনা শুনবার জন্যেই যে রেণুর মা এই কাণ্ডটি করলো এবং ভবিষ্যতেও করবে বেশ জানা ছিলো। জানতাম।

মা আজ মাসের ওপর ওপরে যায় না। ওরা কি টের পায় না কেন। অর্থাৎ মা-র গায়ে আর একটাও গয়না নেই। তারা ধ'রে নিয়েছে। তারা বোঝে। তেল নুন লঙ্কা চেয়ে অভাবের ফুটো সারানো চলে। কিন্তু বড়ো-বড়ো ফাঁক— বাড়িভাড়া, রেশন খরচ, টাটুর দুধের দাম যোগাতে বড়ো-বড়ো জিনিসে হাত পড়ছে। আর, আমরা সর্বনাশের মুখে দাঁড়িয়ে আছি ব'লে সবাই এখন আমাদের সুখ নিয়ে এত বেশি টানাটানি করছে। বিশেষ ক'রে আমার, আমাকেই হাতের কাছে পাচ্ছে, কবে আমার বিয়ে হবে, গায়ে নতুন গয়না উঠলো নাকি ?

দুঃখের মধ্যেও হাসি পায়।

আমার সুখ দিয়ে আমাদের সকলের দুঃখের পরিধি নির্ণয় করছে ওরা। সমস্ত পরিবারের।

অর্থাৎ পরিবারের যে-মেয়েটির ষোলো বছর পূর্ণ হ'লো তার এই পাওয়া উচিত ছিলো, এই হওয়া, তাই কি? পরিবার মেয়ের কোনো দাম দিলে না।

মনে-মনে বলেছি, ওরা যদি জানতো— ওরা জানে না।

ভালোমানুষ, সরল, সত্যপ্রিয় স্নেহান্ধ লোক আধুনিক পৃথিবীতে অচল। বাবার অপরাধ তাই। চেষ্টার ত্রুটি করেনি। এখনো খুঁজছে চাকরি। কে দেয়?

হ্যাঁ, মা-র চোখে পর্যন্ত বাবা অবাস্তর, অপদার্থ, অপ্রয়োজনীয় হ'য়ে গেলো, দেখতে-দেখতে। তোমরা তো হাসবেই। আমার, আমাদের দুরবস্থা দেখে, ষোলো বছরের মেয়ের সম্ভাবিত সুখের ঝিলমিল ধ'রে টানাটানি করবে এ আর বিচিত্র কি। এই নিয়ম।

তাই ভাবছিলাম টাকা চাইতে গেলে কেমন চেহারা হবে ওদের কে জানে।

বরং টাকা ধার চেয়ে না পাওয়ার চেয়ে ওদের হাসিকে আমি ভয় করবো বেশি। আমার একটা-কিছু চরম সুখের কথা তুলে আমার বঞ্চনাকে প্রকটভাবে চোখের সামনে মেলে ধরবার জন্যে তিন-পা এগিয়ে আসবে হয়তো মৃদুলা।

মৃদুলা নার্স। স্বামী-সন্তান লাভের সৌভাগ্য হয়নি এখনো। কেন হয়নি, হবে কিনা তা ও-ই জানে। উজ্জ্বল শ্যামল রং। ত্রিশের কাছে বয়েস। ফিটফাট চেহারা, সেজেগুজে থাকে। অল্প হেসে চটি পায়ে পায়চারি করতে-করতে বলবে, 'তোমার মতো সুন্দর চেহারার মেয়েকে টাকা ধার কে না দেবে, ছেলে-বুড়ো-মেয়ে-পুরুষ সবাই, কিন্তু জিগ্যেস করি, হঠাৎ টাকার দরকার হ'লো কেন, টাকা দিয়ে করবে কি?'

এক চোখ ছোটো ক'রে প্রশ্ন করবে মৃদুলা।

চোখ ঘুরিয়ে মায়া বলবে, 'কেন আর কি, লুকিয়ে লাভারকে কিছু প্রেজেণ্ট করবে, ফটো তুলে রেজিস্টার্ড চিঠি দেবে, দরকার হয়েছে আর-কি বাড়তি টাকার, বাপের খরচে কি আর সব দিক কুলোয় মেয়ের।'

'হ্যাঁ, বয়েস আসে বৈকি একটা ঢেউ-খেলানো, যখন দিগ্‌বিদিক্‌ জ্ঞান থাকে না টাকা চাইতেও। এতে বাপের কলঙ্ক হ'লো কি অকলঙ্ক। শেষটায় কার কাছে গিয়ে পড়বে টাকার জন্যে, তোমরা মেয়েরা কার কাছে কি আছে দিয়ে দাও ভালোয়-ভালোয় অন্নুকে টাকা ধার।' ব'লে মৃদুলা কাটবে। নীচ রসিকতা দিয়ে নিজের অনিচ্ছার নীচতাকে ঢেকে রেখে স'রে পড়বে জানা কথা। তবু ও স্বীকার করবে না শুধু আমার টাকার দরকার নয়, আমাদের, সকলের।

আর মেয়েদের মধ্যে থাকে মায়া এবং রেণু। ওদের হাতে টাকা থাকে না। ওরা পরিষ্কার আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেবে মাকে।

মহিলারা হেসে বলবেন, 'ওই তো মেয়ে মুশকিল বাধালে, টাকা? উঁহু। সব পারি তোমায় দিতে, ওটা পারি না। আমার মেয়েরা গাড়ি ক'রে ইস্কুলে যায় গাড়ি ক'রে ফেরে। ট্র্যাম-বাসের পয়সা বলতেও ওরা হাতে কিছু পায় না। টাকা ধার ক'রে সিনেমা দেখবি? রেস্টুরেণ্টে যাবি? কে, সঙ্গী কা'রা? একলা খুব ঢুঁ মারতে শিখেছিস বুঝি বাইরে। যা, ভাগ্‌। টাকা নিয়ে তুই করবি কি?' বলবে ওরা হেসে।

এই বলছে ওরা যেদিন থেকে শুনেছে আমরা বিপন্ন।

আমার উচ্ছলতার, আমার উজ্জ্বলতার, চপল যৌবনের সব ছবি টেনে আনছে চোখের সামনে।

ডিসেম্বরের এই অদ্ভুত রোদ-পোহানো-দুপুরে বোটানিক্যাল-গার্ডেন্‌ কি ইডেন-গার্ডেনে গিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে পিকনিক করার খরচ যোগাচ্ছে অন্নু। বলবে কেউ।

কেননা, ওরা বেশ জানে এই টাকা এনে আমি বাবার হাতে দেবো। বাবা বাজারে যাবে। তবে আমাদের রান্না চড়বে। টাটু, ডলি খাবে। অর্থাৎ অন্তত এক-দুপুরের মতো ঠাঁই হবে আমাদের দাঁড়াবার।

তবু ওরা জানবে না। হাসি-ঠাট্টার নিচে আমার টাকা-চাওয়া চাপা প'ড়ে যাবে। তেল-নুন-লকড়ি ধার দিলেও টাকা দেবে না কেউ। আমাদের দিয়ে বিশ্বাস কি।

চুপ ক'রে ভাবছিলাম।

দেখি চায়ের কাপ নামিয়ে রেখে বাবা একদৃষ্টে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। অনেকক্ষণ চা খাওয়া শেষ হয়েছে, টের পাইনি।

'আমায় কিছু বলছো, বাবা?' ঢোক গিলে বললাম।

'কাল টালিগঞ্জ থেকে যখন ফিরছি ট্র্যামে অবনী মুখুজ্জের সঙ্গে দেখা।' ব'লে বাবা চুপ করলো। আমিও চুপ ছিলাম। বাবার আর-একটি বন্ধু। বন্ধুরা এখন কেউ আর বাড়িতে আসে না। বাবার সঙ্গে রাস্তায়, ট্র্যামে-বাসে কখনো-সখনো দেখা হচ্ছে আর বাবার অসহায় অবস্থা দেখে আলগা থেকে এক-এক জন এক-এক রকম পরামর্শ দিচ্ছে, উপদেশও বলা যায়; এটা করো, ওটা করো।

একটু পরে আস্তে-আস্তে জিগ্যেস করলাম, 'কিছু কথা হ'লো কি, জানাশোনা আছে তাঁর কোনো চাকরি তোমার—'

দেয়ালের দিকে তাকিয়ে বাবা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললো।

'বললে, টাইপরাইটিং শিখে ফেলো, চাকরি পাওয়া সহজ হবে।'

চুপ আমি। বাবার চোখে জল এসে গেছে।

'এ-বয়সে ও-সব এখন শিখতে পারবো, মা? তুই আমায় একটা বুদ্ধি দে, আমি যে—'

বাবার চেয়ারের হাতল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে ছিলাম। বাবার পিঠের ওপর

আস্তে হাত রেখে আমিও ছোটো একটা নিশ্বাস ফেললাম। বন্ধুরা এ-ধরনের অদ্ভুত সব পরামর্শ দিচ্ছে বাবাকে। যা তার পক্ষে এখন আর সম্ভব নয়। এই বয়সে। সত্যি কি বাবা প্রায় বুড়ো হ'তে চললো না? চোয়াল ব'সে গেছে, দৃষ্টি ক্ষীণ হয়েছে। নতুন ক'রে এখন টাইপ শিখতে গেলে বাবার বুকের হাড় ন'ড়ে উঠবে তা কি আমি জানি না। এদিকেই কবে জানি, বাবার এক বন্ধু, সুনীতিবাবু না কে, বাবাকে পরামর্শ দিচ্ছিলো বিহারের কোন কয়লাখনিতে লোক নিচ্ছে, চ'লে যাক সেখানে। কথাটা শুনে এসে সেদিনও বাবা ছলছল চোখে আমায় বলছিলো। আমার সঙ্গেই আজকাল এ-সব কথা হয়। মাকে তো কিছু বলা যায় না। তখনই হয়তো ঠেলে পাঠাতে চাইতো বাবাকে কয়লাখনিতে। সময়-অসময়, স্থান-কালের সীমা-সংগতি সব ভুলে যাচ্ছে মা। যেখান থেকে পারো টাকা রোজগার ক'রে আনো, যে-ভাবে পারো। দয়ামায়াহীন কঠোর এক-একটা উক্তি। ভয়ে বাবা মাকে কিছু বলে না আর।

বললাম, 'ওদের কথায় তুমি কান দিয়ো না। আর টাইপ শিখতেও তো সময় লাগবে।'

আশ্বস্ত হ'য়ে বাবা আমার চোখের দিকে তাকালো।

'তা ছাড়া মাগ্‌না তো কেউ শেখায় না এ-সব। পয়সা দিয়ে শিখতে হয়—' বাবা একটু সোজা হ'য়ে বসলো।

'তাই তো—' বললাম, বলতে-বলতে হঠাৎ চুপ ক'রে গেলাম।

আমার কান পাশের ঘরে। যেন শুনছি ডলি টাট্টু মা-র পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছে।

এখুনি ওরা কাঁদাকাটি আরম্ভ করবে, মা ছুটে আসবে দরজায়।

যেন বাবাও টের পেলো।

বাবার চেহারা ফ্যাকাশে হ'য়ে গেছে।

অরন্ধনের অন্ধকার দিন আরম্ভ হয়েছে এ-কথা আমার চেয়ে বেশি ছাড়া কম জানতো কি বাবা। দুই আঙুলে কপালের রগ্ দুটো টিপে ধ'রে মেঝের দিকে মুখ ক'রে একটুক্ষণ কি ভাবলো, তারপর আবার আমার চোখে-চোখে তাকালো। অর্থাৎ মা ছুটে আসবার আগেই একটা-কিছু, অন্তত এ-বেলার মতো, যা হোক ব্যবস্থা করতেই হয়। যেমন-তেমন।

'আমায় কিছু বলছো বাবা?' আস্তে-আস্তে বললাম।

প্রথমবার বাবা পারলো না, দ্বিতীয়বারও চেষ্টা ক'রে থেমে গেলো। তারপর চোখের ইশারা ক'রে আমার মাথাটা আরো নোয়াতে বললো। বাবার মুখের কাছে আমি গলা বাড়িয়ে দিলাম। কানে-কানে বাবা কথাটা বললো।

আমি রাজী হলাম, বলামাত্র রাজী হ'য়ে গেলাম। কেননা বাবাকে অদেয় আমার কিছুই নেই। মন বললো।

অপরাধী শিশুর মতো হ'য়ে গেলো বাবার দুই চোখ।

'তোর মাকে কি বলবি?' ভাঙা গলায় প্রশ্ন করলো।

'বলবো, হারিয়ে গেছে।'

এ-কথার পর বাবা আর-কিছু বললো না। আমার নেক্‌লেসটা পকেটে পুরে উঠে পড়লো।

কলঘরে গিয়ে নিজের শূন্য গলার ওপর হাত রেখে বললাম: টাটু ও ডলির দিকে তাকিয়ে, ওদের শুকনো ক্ষুধার্ত চাউনি সহ্য করতে না পেরে মা চুড়ি ও গলার হার খুলে দিয়েছে, আমি দিলাম বাবাকে দেখে, বাবার দুটি চোখ দেখে। আমি ছাড়া বাবাকে কেউ দেখছে না যে পৃথিবীতে।

আশ্চর্য। সারাদিনে মা আর শয্যা ছেড়ে উঠলো না।

বাবা বাজার নিয়ে ফিরেছে, আমি রান্নাঘরে গেছি, টাটু ডলির ইতিমধ্যে গরম ডালপুরি খাওয়া হ'য়ে গেছে চার আনার।

টের পেয়েও মা উঠলো না।

এই আজকাল করছে বেশি মা। আমি যদি ধার করতে গেছি, অর্থাৎ বাবার পক্ষ নিয়ে মাকে থামাবার জন্যে সেদিনের একটা ব্যবস্থায় তাড়াতাড়ি নিজে যেচে পা বাড়িয়েছি, মা সারাদিন আমার সঙ্গে একটা কথাও বলে না। খেপে যায়। কোনো কথা জিগ্যেস করতে গেলে ফোঁস ক'রে ওঠে, 'তুই কেন করতে গেলি, ক'দিন পারবি, কতটুকুন দিতে পারবি আস্ত একটা পরিবারের ভুখার কাছে নিজেকে। তুই স'রে আয়। স'রে দাঁড়া।'

আমি স'রে দাঁড়াই না। মা অতিরিক্ত রকম নিষ্ঠুর হ'য়ে ওঠে তখন আর-একজনের ওপর, 'যে-সংসার ভেঙে গেছে, ফুটো হয়েছে তলা, তাকে ভাসিয়ে রাখবার জন্যে মেয়ের সাহায্য নিতে লজ্জা করে না? মেয়েকে দিয়ে ধার করিয়েও তোমার দাঁড়িয়ে থাকবার আকাঙ্ক্ষা, এই তো দেখছি। অক্ষম পুরুষ তা-ই করে।'

তারপর মা নিজের মনে বলে, 'পনেরো বছরের একটা মেয়ে সেকেণ্ড-ক্লাসে পড়ে, সংসারের ও বোঝে কি, বড়ো যে কথায়-কথায় ওর দিকে তাকানো।'

তখন আমি ভাবি, যদি ছেলে হতাম। তা হ'লে কি এই বিপদে নিজেকে আর-একটু বাড়িয়ে দিতে পারতাম না। আমার জায়গায় একটি ছেলে এ-সংসারের পক্ষে বেশি কাম্য ছিলো যে।

আজ আর টুকিটাকি জিনিস না। পাঁচ-সাত টাকা ধার চেয়ে এনেছি আমি কারো কাছ থেকে। শুয়ে-শুয়ে মা ভাবছে। এবং এই ঘৃণায় সারা-দিন মা-র মুখে জল পর্যন্ত উঠবে না জানি।

রান্নাবান্না শেষ করলাম বটে, ডলি টাটু অনেকদিন পর দু-টুকরো মাছ দিয়ে পেট ভ'রে ভাত খেলো। কিন্তু আমার মনের ভার কাটলো না।

মেয়েকে দিয়ে টাকা ধার করানোর ঘৃণায় মা খেতে এলো না ব'লে নয়, টাকা ধার করার সামর্থ্য যখন ফুরিয়েছে তখনো আমি সাহায্য করতে গেছি, মানে আরো এক-পা বাড়িয়েছি। যদি মা জানতো, টের পেতো গলার হার খুলে দিয়েছে আজ অনু।

কিন্তু সেজন্যে তো আমার মন খারাপ নয়, ভয় হচ্ছিলো, তারপর কি হবে।

কাল-পরশুর মধ্যে টাকা ক'টা ফুরোবে।

আবার একদিন রান্না বন্ধ হবে।

ডলি টাট্টু কেঁদে উঠবে। তখন আমি করবো কি ?

মা-র বাক্যবাণে জর্জরিত ক্লান্ত বিষণ্ণ বাবা আবার যখন আমার দিকে চোখ তুলে তাকাবে তখন আমি কি দেবো তাকে, কি দিয়ে আশ্বাস দিই।

যদি আমার আরো দু-পদ গয়না বেশি থাকতো! এক-সময় ঈশ্বরকে ডাকলাম। না, গয়না নয়, মনে-মনে বললাম, গয়না ফুরোয়, আরো বেশি, এমন-কিছু যা মা-র চোখে পড়ে না। অথচ সংসার চলে। মা-র অজানতে আমি চালিয়ে নিচ্ছি গোটা পরিবার, বাবা যতদিন না পারছে। এমন কি হয় না ? এমন কি করে না আমার বয়সের কোনো মেয়ে ?

ঈশ্বর আমার ডাক শুনলো।

অঘ্রাণের রাত। ডলি টাট্টু সকাল-সকাল খেয়ে ঘুমিয়ে আছে। মা আর উঠলো না। আলো নেভানো ঘরের। রুক্ষ ঠাণ্ডা-টা ক'মে গেছে, আকাশ মেঘ-মেঘ। হাওয়াটা কেমন নরম মোলায়েম ঠেকছিলো অনেক-দিন বাদে। ফাল্গুনী হাওয়ার মতো। আমি বারান্দায় দাঁড়াই।

না, অকালবসন্তের কথা ভাবিনি আমি। ভাবছিলাম বাবার কথা। কত রাত ক'রে ফিরবে কে জানে, বেরিয়েছে কাজের চেষ্টায়— একদিন

কি বিশ্রাম নিলে হয় না। আশ্চর্য, একদিন, একটা দুপুর বাবা ঘরে ব'সে থাকতে পারলো না চাকরি গেছে পর থেকে— রোজ বেরোচ্ছে, যেন মা-র ভয়েই আরো বেশি বাইরে-বাইরে থাকছে। আর ফিরছে গভীর রাত ক'রে, শেষ ট্র্যাম যখন যায় কি আসে, কি তারও পরে। ক্লান্ত কুণ্ঠিত একখানা হাত চোরের মতো আস্তে-আস্তে সদরের কড়া নাড়ে, আমি টের পাই, আমি জেগে থাকি তার অপেক্ষায়, দরজা খুলে দিই।

ভাবছিলাম। রাত ন'টাও বাজেনি আজ— হঠাৎ সদর ন'ড়ে উঠলো। চম্‌কে উঠলাম। হ্যাঁ, বাবার গলা, ফিরে এসেছে।

'বারান্দায় আলো জ্বেলে দে, অনু।' শুনলাম।

তাড়াতাড়ি আলো জ্বেলে দিই। দরজা খুলে দিয়ে আমি থমকে দাঁড়াই, তারপর চ'লে আসি রান্নাঘরে।

দেখি একমিনিট পর বাবা আমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

'আমার বন্ধু রাজশেখর, দেখা হ'য়ে গেলো রাস্তায়।'

চাপা রুদ্ধ কণ্ঠস্বর বাবার। যেন কি জিগ্যেস করতে গিয়ে হঠাৎ আমি থামলাম।

'চা কর।' আমার চোখের দিকে না তাকিয়ে বাবা বললো, 'চা নিয়ে চট্ ক'রে চ'লে আয়, আমি আছি ওখানে, আমি থাকবো।' বাবা রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে গেলো।

আমি তেমনি দাঁড়িয়ে। সত্যি, একমিনিট আমি কিছুই করতে পারিনি। তারপর চায়ের কেটলিতে জল ঢালি, আগুন জ্বালি নতুন ক'রে।

চা নিয়ে যাবার আগে আবার ভাবলাম মাকে ডাকবো কি ডাকবো না। কিন্তু ডাকা হ'লো না।

অন্যদিনের মতো বাবার দিকে চেয়ে বাবার কথা ভাবতে-ভাবতে চা

নিয়ে আমি চৌকাঠের বাইরে গেলাম। দরকারী লোক সঙ্গে নিয়ে এসেছে বাবা, বাবার একটা সুবিধা হচ্ছে কি ? ভাবলাম।

আমার পড়ার ঘর।

আমার সেই ছোট্টো টেবিল, যেখানে পাটীগণিত, সরল হাইজিন আর ডেভিড কপারফিল্ড সাজানো থাকে, থাকতো, সেখানে চায়ের কাপ নামিয়ে রাখার নির্দেশ দেয় বাবা।

'এক্সেল ! চমৎকার !' হৃষ্ট উল্লসিত একটা নিশ্বাসপতন-শব্দ কানে এলো আমি টেবিলের সামনে দাঁড়াতে।

তখন আমি চোখ তুললাম।

বাবার চেয়েও বুড়ো বাবার বন্ধু। চুল অনেক বেশি পাকা। কিন্তু বাইশ বছরের একটি ছেলের মতো চাঁছা পালিশ ঘাড়, অদ্ভুত পরিচ্ছন্ন পোশাক, আর তার চেয়েও অদ্ভুত লাগলো বকের পাখার মতো শাদা ধবধবে বাঁধানো দাঁতগুলো। দেখে কেমন ভয় করছিলো আমার। এক চোখে চশমা, ফিতেটা কাঁপছে। কালো ছুরির ফলার মতো চওড়া ফিতে।

'আশ্চর্য, তোমার মেয়ে এত বড়োটি হয়েছে একদিনও আমায় জানাওনি, যতীশ।' বাবার দিকে নয়, আমার দিকে তাকিয়েই শাদা দাঁতগুলো হাসছে। 'তোমার নাম কি খুকি ?'

নাম বললাম।

কুণ্ঠিত কৃতার্থের ভঙ্গিতে বাবা দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে।

'তুমি আর-একটু সোজা হ'যে দাঁড়াও।' প্রত্যাদেশ করলেন হঠাৎ আমাকে অভ্যাগত। তেমনি চুপচাপ। দেখছে।

আমি সোজা হ'যে দাঁড়াই।

'এবার ঘুরে দাঁড়াও।'

আমি তা-ই করলাম।

'বাঁ-হাতটা একটু তুলে ধরো।'

ভয়ে-ভয়ে আমি হাতও তুললাম।

'গালটা দেয়ালের দিকে ঘোরাও।'

আমি গাল ঘুরিয়ে দেয়ালের দিকে রাখলাম।

'হবে, খুব হবে।' যুগপৎ প্রচণ্ড উৎসাহ ও চায়ের কাপে দীর্ঘ চুমুকের শব্দ কানে এলো। 'আমার হাতে ছেড়ে দাও, কী আমি ওকে ক'রে তুলি গ্যাখো-না, যতীশ।' চা শেষ করার একটু পরে তিনি উঠে পড়েন। রাস্তা পর্যন্ত বাবা বন্ধুর সঙ্গে গেলো। শুনলাম গাড়ির শব্দ।

ফিরে এসে বাবা বললো, 'তোর খুব প্রশংসা করলো।'

ভ্রূ-কুঞ্চিত হয়েছিলো যেন আমার একটু, ঈষৎ হেসে ঢোক গিলে বললাম, 'কি বললেন উনি ?'

'তোর নাক-চোখ, হাত-পা, কোমর-বুক সব সুন্দর, বললে, খুব ভালো হবে।' আমার শরীরের ওপর চোখ রাখলো বাবা।

এবার সত্যি আমার ভুরু কুঁচকোয়, টের পাই।

'কী হবে সুন্দর বুক আর কোমর দিয়ে ?' গলা কাঁপছিলো আমার।

'তিনটে সিনেমা-কোম্পানিতে টাকা ঢালছে রাজশেখর রায়, বলছে, তোকে—'

বললাম, 'তোমার খাওয়া হয়নি, বাবা, কাপড় ছেড়ে মুখ-হাত ধোও।'

'তোর ইচ্ছে নেই, অনু ?' বাবা আমার হাত ধরলো। 'তোর মা-র কথা ছেড়ে দে, এই অবস্থায় তুই যদি এখন—'

না, বাবা আমার হাত ধরছে ব'লে কি! আমি পারি না, আমি

পারিনি আমার শরীরের ওপর সেই কাতর বিষন্ন স্থির দৃষ্টি বেশিক্ষণ ধ'রে রাখতে। ছুটে এলাম ঘরে, মা-র ঘরে।

আশ্চর্য, অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থেকে তখনো আমি ভাবছি মাকে বলবো কি বলবো না।

তারিণীর বাড়ি-বদল

টেনে-টেনে ওরা সব এনে ঠেলাগাড়িতে তুললো। কুনো ডেকচি, মশারি, ছাতা, লণ্ঠন, মাদুর, বালিশ, জুতো, ফুটো একটা কড়াই। একটা ফানুস, রং-চটা ফাটলধরা গণেশের মূর্তি, দুটো হাতি, গামলা, ইঁদুর-মারা কল, বাক্স, জীর্ণশীর্ণ একটা স্যুটকেস।

তার অর্থ তারিণী চ'লে যাচ্ছে।

তারিণী বাড়ি ছেড়ে দিয়ে অন্যত্র স'রে পড়ছে। পরিষ্কার বোঝা গেলো। প্রতিবেশীদের কারো বুঝতে কষ্ট হ'লো না ব্যাপারটা কি।

চৈত্রের গনগনে রোদ।

দুপুরবেলা, রাস্তার দোকানপাট অধিকাংশ বন্ধ।

এমন সময়, এমন অসময়ে প্রেসে না গিয়ে জামার আস্তিন কনুইয়ের ওপর গুটিয়ে খালি-পা রুক্ষ-চুল ব্যস্তসমস্ত তারিণী ঘরের তৈজসপত্র ও স্ত্রীপুত্রকন্যা-সহ কোনদিকে যাত্রা করছে, দাঁড়িয়ে যার-যার দরজা-জানলায় মুখ বাড়িয়ে পাড়ার লোকজন নিজেদের মধ্যে গুন্‌গুন্ স্বরে নানারকম গবেষণা করলো।

ওরা কতকালের বাসিন্দা। ঠিক কবে এসেছিলো এই গলির মধ্যে, সতেরো নম্বর ঘরে, অনেকেই জানে না। বুঝি ওটা সতেরোর বি, কেউ-কেউ ভাবলো।

এখন মনে পড়ে, এখন শুধু চোখের ওপর ভাসছে সবারই, তারিণীর বউ ঘরের সামনের ছোট্টো রকটুকুর ওপর রোজ সকাল সন্ধ্যা একটা তোলা-উনুন ধরিয়ে নিয়েছে। প্রেস-ফেরত তারিণী রেশনের থলে,

কখনো-বা বাজার অর্থাৎ বার্লির ডিবি কি ডাঁটামুলো নিয়ে ঘরে ফিরেছে লম্বা পা ফেলে। আর তারিণীর এক-দঙ্গল ছেলেমেয়ে সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত হোস-পাইপের মুখে, রাস্তায়, লোকের বারান্দায়, উড়ের পানের দোকানের সামনে, যোগেশ রুদ্রের ড্রাইংক্লিনিং-এর দরজায় হুড়োহুড়ি ছুটোছুটি মারামারি ক'রে পাড়া গরম রেখেছে, রাখছিলো এ-অবধি।

আজ সব ঠাণ্ডা।

যার যেমন জামাটি জুতোটি প'রে, ঠেলায় ধরছে না এমন এক-একটা বস্তু, যেমন হাতপাখা, খুন্তি, ভাঙা হারমোনিয়ামের খোলা রীড্, বাঁধানো ফটো, কি ছেঁড়া-মলাট তেলচিটে বছর-পুরোনো গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকাটি হাতে ক'রে গাড়ির সামনে-পিছনে দু-পাশে গোল হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছে।

তখনো জিনিস বার করা হচ্ছিলো।

তারিণীর স্ত্রীর খোঁপা খুলে গিয়ে পিঠের ওপর লুটোপুটি। ঘোমটার আঁচল একটা ব্র্যাকেটের বোল্ট্-এর সঙ্গে আটকে গিয়ে জড়িয়ে প্রায় কোমরের কাছাকাছি নেমে এসেছে। ব্র্যাকেটের আর-এক প্রান্তে হাত রেখে ওটাকে জোরে টানতে-টানতে তারিণী শাসাচ্ছে, গর্জাচ্ছে। তারিণীর স্ত্রীর মুখ কান গরমে লাল ঘামে ভেজা দুঃখে কালো হ'য়ে গেছে, অনেকের চোখে পড়লো।

কোথায় যাচ্ছে, তার আগে গবেষণা চললো কেন যাচ্ছে, হঠাৎ বাড়ি ছেড়ে উঠে যাবার কি হ'লো।

পানের দোকানের উড়ে চোখ টিপে তারিণীর বড়ো মেয়ে এগারো বছরের ধিন্দিকে কাছে ডাকলো। ধিন্দি নয়, ধন্দি। ছোটোগুলোর ডাক শুনে উড়ে কুমারী মীরা ব্যানার্জির এই নাম ঠাউরে নিয়েছে। মীরা এখন বাপের সামনে শান্তশিষ্ট, অন্য সময়, তারিণী যখন বাইরে থাকে, ছুটে গিয়ে

উড়ের পিঠে কিল্ বসিয়ে দেয় আর ওর কাটা-সুপুরি এলাচদানা মুঠো-মুঠো ক'রে মুখে পুরে খিল্‌খিল্ হাসে।

সেই দস্যি মেয়ে ধিন্দিকে আর দেখতে পাবে না, কাছে পাবে না ভেবে এবং মেয়ের গায়ে বাক্স-পুরোনো বেজায় জ্যালজেলে টিয়ে-রঙের লম্বা একটা জামার দিকে চেয়ে অবাক চোখে উড়িষ্যার মধুসূদন চুপ ক'রে গেলো। আর চোখ টিপলো না।

ড্রাইংক্লিনিং-এর ছোক্‌রা নরেশ তারিণীর দ্বিতীয় ছেলে সমবয়সী ডাণ্ডা, মানে সন্তোষকুমারকে কাছে ডাকলো না। সাহস পেলো না ডেকে জিগ্যেস করে ঘর ছেড়ে রাতারাতি ওরা কোথায় চললো, কেন গেলো।

ড্রাইংক্লিনিং-এর ধোবার কাছ থেকে ডাণ্ডা অনেক নীল অনেক চুম্‌কি মুঠ-মুঠ ক'রে নিয়ে গেছে লুঠ ক'রে, অনেক সময় চুরি ক'রেও। নরেশ সমবয়সী বন্ধুর অত্যাচার সহ্য করেছে— করতো। আজ অবাক চোখে দেখলো, ডাণ্ডা চটি ও পেন্টুলন প'রে ভদ্র হ'য়ে একটা আরশি হাতে ঠেলার সামনে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে।

তেলেভাজার গিরীশ তারিণীর বাকি ছোটো আটটার উৎপাতে উত্তেজিত হ'য়ে বেসনের কাই মাখিয়ে দিতো সবগুলোর মুখে, তবু ওরা তেলেভাজা খাওয়া থেকে নিবৃত্ত হয়নি। সারা প্রহর মাছির মতো ভন্‌ভন্ ক'রে উড়তো ঘুরতো, গিরীশকে জ্বালাতন ক'রে মারতো। আজ সব চললো কোথায়।

গিরীশ একটিকেও ডাকলো না, তেলেভাজার ঝুড়ি সামনে নিয়ে তারিণী আর তারিণীর স্ত্রীর ব্র্যাকেট তোলা দেখতে লাগলো ঠেলার ওপর। তারিণী তুলছে, বউ ঠেকা দিচ্ছে। বউ ঠেলছে, তারিণী শক্ত ক'রে ধরেছে।

ঠেলাওলা কোমরে গামছা বেঁধে হাত লাগাতে এসেছিলো। তারিণী

হটিয়ে দিয়েছে। নিজের জিনিস সে নিজে দেখেশুনে নেবে। একটা-কিছু ভেঙে গেলে এ-জীবনে আর করা হবে না, গজ্‌গজ্‌ ক'রে তারিণী বলছিলো, তার মুখের ভাবে সবাই বুঝলো। জিনিস তুলতে জিনিস বাঁধতে তারিণীর যত্নের ও পরিশ্রমের অন্ত ছিলো না, আর থেকে-থেকে বউ ধমক খাচ্ছিলো, 'ওটা এমন ক'রে রাখলে কেন, জ্বালা!'

'ইজেক্‌ট্‌মেন্টের নোটিস এসে গেছে।' হোমিওপ্যাথ হেমাঙ্গবাবু হুঁকো-হাতে ডিস্‌পেনসারির বারান্দায় দাঁড়িয়ে ও-বাড়ির রিটায়ার্ড ওভারসিয়র মঙ্গলবাবুর সঙ্গে মৃদুমন্দ গলায় আলোচনা করেন।

'এই রাবুনে গুষ্টি নিয়ে এ-দিনে ও এ-পাড়ায় কি ক'রে ছিলো,' বলছিলেন রিটায়ার্ড মুন্সেফ তারকবাবু প্রতিবেশী সোমনাথবাবুকে। 'ঘরের ভাড়া তো কম নয়।' সোমনাথবাবু হাহা ক'রে শুধু হাসলেন।

সামান্য একটা প্রেসে চাকরি যার, যার এতগুলো ছেলেমেয়ে, এই দুর্মূল্যের বাজারে সবদিক সামাল দিয়ে শহরের মোটামুটি সচ্ছল একটি পাড়ায় রীতিমতো দুই-কোঠার একটি ঘর দখল ক'রে প্রতি মাসের ভাড়াটি মিটিয়ে যাওয়া তারিণীর পক্ষে আর কোনোমতেই সম্ভব ছিলো না, তারকবাবুর অভিজ্ঞ পাকা হাসিতে সে-কথা ঝ'রে পড়লো। সোমনাথবাবু মাথা নাড়েন।

'ওর চাকরিটিও যে না-গেছে বিশ্বাস কি।' কে একজন বললো।

'হবে।'

'হাহাকার প'ড়ে গেছে দেশে। মানুষ মোটা মাইনের ওপর দাঁড়িয়েও একলা চালাবার মতো ক'রে ঠিক পেটটি চালাতে পারছে না, আর এ তো—'

'আ-হা, এতগুলো কাচ্চাবাচ্চা নিয়ে স্বামী-স্ত্রী এখন দাঁড়ায় কোথায়।' কে-একজন মহিলার দরদভরা কণ্ঠস্বর শোনা গেলো।

গোলাপের জঙ্গলে জানলা আবৃত। তাই সুভাষিণীর মুখ দেখা গেলো না।

'তেমন বয়েসও যে হয়নি দু-জনের।' কে আর-একজন মহিলার গলা শোনা গেলো।

একটা সুন্দর প্রজাপতি উড়ছিলো জানলায়। কয়েক জোড়া কালো ঠাণ্ডা চোখ তারিণী আর তারিণীর স্ত্রীকে নিরীক্ষণ করছিলো।

কিন্তু কারো দিকে তাকাবার, কারো কথা শোনার সময় ছিলো না তারিণীর, তারিণীর স্ত্রীর।

তারিণীর শার্টের কলার ছিঁড়ে গেছে ব্র্যাকেটের একটা জং-ধরা-পেরেকের খোঁচা লেগে।

তারিণী স্ত্রীকে বকছিলো।

বউ-এর শাড়ির আঁচলও ছিঁড়েছে দু-জায়গায় ব্র্যাকেটের খোঁচায়। পাছে তারিণীর চোখে পড়ে, আবার বকুনি খাবে ভয়ে বউ আঁচলের ছেঁড়ার দিকটা বাঁ-মুঠোর মধ্যে গুঁজে ডান-হাতে ব্র্যাকেটের শেষ প্রান্তটি ধ'রে অনবরত ঠেলছিলো, ডেক্‌চি ও কলসীর কানার ফাঁকে কায়দা ক'রে ওটাকে ঢুকিয়ে রাখা চলে কিনা। তারিণীও গলদ্‌ঘর্ম হ'য়ে তার চেষ্টা করছিলো। এবং শেষ পর্যন্ত পারলেও।

বউ-এর ফর্সা আঙুলে হলুদের দাগ প্রতিবেশী ও প্রতিবেশিনীদের চোখ এড়ালো না।

'ছেলেপুলের মুখে দুটি গুঁজে দিতে পেরেছে যাত্রার আগে?' কে-একজন বললো।

'কিন্তু যাচ্ছে ওরা কোথায়?' একজন আবার প্রশ্ন করলো।

'বেলেঘাটায় নাকি ঘর পেয়েছে, শুনলাম।' উত্তর হ'লো।

অদৃশ্য মুখ, অস্ফুট গলার গুঞ্জন।

তারিণী ততক্ষণে মালপত্র বাঁধার কাজ শেষ করেছে। চৈত্রের বাতাসে ছোটো একটা ধুলোর ঘূর্ণি উড়লো, তারিণীর স্ত্রীর পায়ের কাছে শুকনো পাতা ও ছেঁড়া কাগজের টুকরো গিয়ে উড়ে-উড়ে পড়ছিলো।

এইবার রওনা হবে।

বউ মাথায় কাপড় তুলেছে। একটা বিড়ি পকেট থেকে বার ক'রে টানতে-টানতে তারিণী ঠেলার সঙ্গে হাঁটবে ভেবে সবে মুখে গুঁজেছিলো। চমকে উঠলো। বিড়িটা প'ড়ে গেলো মাটিতে।

'শালা, আমার বিল না মিটিয়ে পালাচ্ছো কোথা ? উনিশ টাকা চোদ্দ আনা এখানে রেখে যাও।' মুদি। পাড়ার মুদি এককড়ির গলা, সবাই বুঝলো।

আমাদের জানলাগুলো আস্তে-আস্তে বন্ধ হচ্ছিলো। 'এই শালা ডাণ্ডা, মেরা ঢাই মণ কয়লেকো দাম জল্‌দি মেটাও।'

কয়লার দোকানের রামশরণের গলা।

এসেই রামশরণ তারিণীর বড়ো ছেলে ডাণ্ডার, সন্তোষের, হাত চেপে ধরেছে। তারিণী অন্য কাজে ব্যস্ত ছিলো ব'লে শেষবারের কয়লাটা সন্তোষই নাকি ধারে এনেছিলো।

কয়লাওলা গলা বড়ো ক'রে প্রতিবেশীদের দরজা-জানলার দিকে মুখ ক'রে কথাটা প্রচার করলো।

'ভদ্রলোকদের সঙ্গে কারবারে এ-দিনে এই লাভ!' রামশরণ পরিষ্কার বাংলা ভাষায় কথা বললো, 'আড়াই মণ জ্বালানির দাম না মিটিয়ে তারিণীবাবু চোরের মতো ঠিকানা পাল্টাচ্ছে।'

পরনে জুতো, গায়ে শার্ট।

তারিণী যে বাবু-শ্রেণীর, কথাটা অস্বীকার করার উপায় ছিলো কি। পুরোনো এবং জায়গায়-জায়গায় ছিঁড়ে গেলেও ছেলেমেয়েগুলোর

প্রত্যেকের গায়েই জামা ছিলো। সম্ভবত বিয়ের সময়ের পুরোনো একটা বেনারসী জড়িয়েছে তারিণীর স্ত্রী। দুই পায়ের গোড়ালিতে ফ্যাকাশে একটুখানি আলতার পোঁছও দেখা যাচ্ছে।

'বড়ো যে সাজগোজ ক'রে চললে বৌঠান, মোট এগারো সের দুধের দাম পাওনা, ওটি মিটিয়ে যাও।' মিশিমাখা কালো দাঁত বের ক'রে গয়লা-বউ প্রথম তারিণীর স্ত্রীর দিকে, তারপর কটমটে চোখে ঠেলার ওপর স্তূপীকৃত মালপত্রের দিকে, তারিণীর দিকে, তারিণীর ছেলেমেয়েদের দিকে চেয়ে রইলো। গয়লানীর হাতে শূন্য দুধের বাল্‌তি। দুধ বিলানো শেষ ক'রে ঘরে ফিরছিলো।

প্রস্থানোদ্যত তারিণীর পা সরলো না। আনত চক্ষু। ছেলেমেয়েগুলো নীরব। হেঁটমুখ হ'য়ে ওরা পোকায়-খাওয়া ফটো, খুন্তি, পঞ্জিকা, হাতপাখা, হারমোনিয়মের কতকগুলো ভাঙা রীড, যার যেটি ব'য়ে নেবার শূন্যের ওপর ঠিক ধ'রে রেখে অপেক্ষা করছিলো কখন বাবার আদেশ হবে 'হাঁটো,'— ঠেলার সঙ্গে-সঙ্গে ওরা হাঁটবে, বলতে গেলে ঠেলাগাড়ির চাকা ছুঁয়ে-ছুঁয়ে। এই শহরের রাস্তায় ট্র্যাম বাস ট্যাক্সি রিক্সা লাখো-লাখো দ্যাখে ওরা, দেখছে। গাড়িতে না চাপুক, গাড়ির সঙ্গে কি পিছু-পিছু ছুটে যাবার কল্পনা করছিলো রোজ। আজ অসময়ে, হঠাৎ, দুই চাকার এই কাঠের গাড়ি দরজায় এসে দাঁড়ালো, তার ওপর উনুন ঝাঁটা ডেকচি মশারি পিঁড়ি কম্বল, সব— ঘরের সব-কিছু চাপিয়ে ওরা গাড়ির সঙ্গে হেঁটে দীর্ঘ কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট ও হ্যারিসন রোড পার হবে, তারপর এক-সময়ে সার্কুলার রোড হ'য়ে বেলেঘাটার সড়কে গিয়ে পড়বে। অচেনা জায়গা, নাম-না-জানা ঠিকানায় নতুন নম্বরের বাড়ি। ভাবছিলো প্রত্যেকটি শিশু। প্রত্যেকটির চোখে ছিলো সেই শঙ্কা, উত্তেজনা, আশা, ভয়, শিশিরের ফোঁটার মতো টলটলে কম্পমান কৌতূহল।

তারিণীর স্ত্রী হাত বাড়িয়ে সবচেয়ে ছোটোটার নাকের সিক্‌নি মুছে দিলো।

'কখন যাবো মা?' বলছিলো ওর বড়োটি।

তারিণীর স্ত্রী চোখের ধমকে থামিয়ে দিয়েছে। 'আমি ঠিকানা দিচ্ছি,' বলছিলো তারিণী এককড়ির হাত ধ'রে, 'যেয়ো, সামনের মাসে টাকাটা দিয়ে দেবো।'

'ঠিকানা দিচ্ছি!' ঝট্‌কা মেরে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে এককড়ি ভেংচি কাটলো, 'কত শালা ঠিকানা দিয়ে পালালো, নতুন ঠিকানায় পা দিতে না দিতে বেঠিক হ'লো। আমি ছাড়চিনে তারিণীবাবু, তোমার মালপত্র আট্‌কাবো, টাকা ফেলো।'

'হঁ্যা, এইসা বাত্‌।' রক্তচক্ষু রামশরণ ঠেলার পিছনটা চেপে ধরেছে।

'হামি বেইজ্জত করবো তারিণীবাবু টাকা না দিয়ে গেলে।'

কথা কাটাকাটি চলছিলো গয়লানী আর তারিণীতে। গয়লা-বউ শক্ত হাতে ঠেলার মাথা চেপে ধরলো। 'হামি মালসাটি ছাড়বো না দুধের দাম না মিটিয়ে গেলে, অত সময় নেই রোজ তোমার বেলেঘাটার ঘরে গিয়ে তাগিদ লাগাবো।'

তারিণী চুপ।

আর-একটা ধুলোর ঘূর্ণি উড়লো।

একটা কুকুর ঘেউ-ঘেউ ক'রে থেমে গেলো।

ডিস্‌পেনসারীর বারান্দা ছেড়ে হেমাঙ্গবাবু ভিতরে চ'লে যান। সোমনাথবাবু স'রে পড়েন।

আরো দু-জন প্রতিবেশীর জানলা বন্ধ হওয়ার আওয়াজ হ'লো, যেন শার্সিগুলোও নামিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

'তুম্ শালা চোট্টা আছো।' তারিণী কথার উত্তর দিচ্ছে না তাই রামশরণ গর্জে উঠলো।

তারিণী প্রতিবেশীদের দরজা-জানলার দিকে একবার সকাতরে তাকালো।

তাতে ফল হ'লো না বিশেষ।

'বড্ডো দেরি ক'রে ফেলেছে,' নিচু-গলায় প্রতিবেশীরা বলাবলি করছিলো, 'ঋণের দায়ে পালাচ্ছে, স'রে যাচ্ছে এখান থেকে আমরা কি আগে জানতাম, না কোনোদিন এসেছিলো ও কারো কাছে। অমন এক-টাকা দু-টাকা ক'রে সাহায্য করলেও তো তারিণী অনেকটা হাল্‌কা হ'তে পারতো, পাড়ায় এতজন ছিলুম আমরা।'

তারিণী শুনলো কি শুনলো না ঠিক বোঝা গেলো না।

'আত্মসম্মানবোধ টন্‌টনে।' মৃদু-গলায় কে আর-একজন মন্তব্য করলো, 'আট গণ্ডা ছেলেপুলের বাপ, একটা সুবৃহৎ তরণীর হাল ধ'রে সংসার-সমুদ্রে পাড়ি জমিয়েছে। চাকরি করছে বাজারে নামও লিখিয়েছে। এখন ওর খুকির দুধের দাম, রেশন খরচের জন্যে আমাদের দরজায়— বুঝলে না ?'

'মানুষের দুর্বুদ্ধি।' আর-এক জন প্রতিবেশীর ঘন নিশ্বাসপতনশব্দ শোনা গেলো।

কি, তারিণীর ধার করতে যাওয়া, না সে-সব শোধ না ক'রে পালিয়ে যাওয়ার মতলব, প্রতিবেশীদের আলোচনা থেকে এর পরিষ্কার উত্তর পাওয়া গেলো না।

হঠাৎ দেখা গেলো তারিণী উত্তেজিত হ'য়ে উঠেছে, ঘাড় সোজা ক'রে এককড়িকে বলছে, 'টাকা পাবে কোর্টে গিয়ে নালিশ করো, খবরদার, মালপত্রের গায়ে হাত দিয়ো না, ফ্যামিলীম্যান, আমি ভদ্রলোক, এই— এই—'

কিন্তু শোনে কে।

এককড়ি ঠেলা ধ'রে ঝাঁকুনি মেরেছে। রামশরণ সাহায্য করছে। আর হাততালি দিয়ে মজা দেখছে গয়লা-বউ। হাসছিলো না, বরং দাঁতে দাঁত ঘ'ষে কঠিন শপথবাণী উচ্চারণ করছিলো তারিণীকে, তার পরিবারকে। গয়লা-বউ আরো দু-জায়গায় ঠকেছে এমন ক'রে।

টাকা না দিয়ে সব পালিয়েছে।

বছর-ভর ভদ্রলোকদের বাচ্চাদের সে দুধ খাওয়ায় আর গরিব গয়লানীকে তারা এমনভাবে ঠকায়। রুপোর বৈঁচিপরা দু-খানা হাত বার-বার শূন্যে উত্তোলন ক'রে দুধওয়ালী পাড়ার বাতায়নবর্তিনী অন্যান্য প্রতিবেশিনীদের কানে যায় এমন চড়া গলায় বললো, 'টাকা দিতে পারে না তো বছর-বছর নতুন ছানা ছাড়বার শখ কেন। বেশ তো, ছানা আটকাতে না পারো নুন খাওয়াও, পানি পিয়াও, কমলার বাল্‌তির এক-টাকা সেরের দুধ বাচ্চার গলায় ঢালবার বাবুগিরি কেন!'

যেন কমলার জিহ্বা থেকে আগুন ঝরছিলো।

বাগে পেয়েছে ও, সস্তা-চটি-পায়ে প্রেসের বাবুর স্ত্রীকে দুটি কথা শোনাচ্ছে।

গয়লানীর পায়ে জুতো নেই, কিন্তু পরনের শাড়ি তারিণীর স্ত্রীর শাড়ির চেয়ে অনেক বেশি সুন্দর। দামী। পাড় ও আঁচল অনেক বেশি জমকালো। পান-দোক্তার রসে জিহ্বা ও ঠোঁট রক্তিম। চোখে প্রচুর রসিকতা।

কথা শেষ ক'রে পুরুষ পাওনাদার দু-জনের দিকে চেয়ে তেরছা ঠোঁটে কমলা হাসলো।

এককড়ি মুদি চড়া গলায় জানিয়ে দেয়, টাকা শোধ না ক'রে তারিণী-বাবু ঘরের একটা ভাঙা পিঁড়িও সরাতে পারবে না।

ব'লে সে ঠেলার পিছন ধ'রে এমন জোরে ঝাঁকুনি দিলো যে জিনিস-পত্রের মচমচ আওয়াজ শোনা গেলো, এখনি কোনটা পড়ে, কোনটা ভাঙে।

একটা অপমান, উলঙ্গ লজ্জা ভদ্রপাড়ার মাঝখানে যেন ঝুলছিলো। রক্ষা, প্রতিবেশীদের শেষ জানলাটিও বন্ধ হ'য়ে গেছে।

তারিণী ফ্যালফ্যাল চোখে চেয়ে দেখছে।

ঠেলার বাঁ-দিকে বেতের মোড়ার ওপর চিৎ ক'রে দুটো কড়াই বসানো। কড়াই দুটোর পেটের মাঝখানে তারিণী খুব সাবধানে শিশি ও কাচের বোয়মগুলো বসিয়ে দিয়েছে।

এককড়ির হাতের প্রথম ধাক্কায় একটা বড়ো বোয়মের গলা ফেটে চৌচির হ'য়ে গেলো।

দ্বিতীয় ধাক্কায় ভাঙলো তারিণীর স্ত্রীর উনুনের চূড়া। আল্‌গা হ'য়ে গেলো।

তারপর ভাঙলো তারিণীর অনেক কষ্টে গ'ড়ে-তোলা বৈঠকখানার বাজার থেকে কিনে-আনা গড়গড়াটা। গাড়ির মাঝামাঝি এক জায়গায় লেপ-তোশকের ভাঁজের ভিতর বেশ কায়দা ক'রে তারিণী ওটা বসিয়ে নিয়েছিলো।

বিড়িতেও কম পয়সা যায় না, রোজ বউকে অনেক বুঝিয়ে এক মাসের মাইনে থেকে টেনে-হিঁচড়ে পাঁচটা টাকা বের ক'রে তারিণী কবে যেন বেশ দুঃসাহসে ভর ক'রেই ওটি কিনে ফেলেছিলো। অনেক আগে। একমাত্র বিলাসের সামগ্রী গড়গড়াটা ভাঙবার পর তারিণীর ধৈর্যের বাঁধ ভাঙলো।

কিন্তু তারিণী হঠাৎ এমন কাণ্ড করবে কারো জানা ছিলো না।

পা-দুটো ঠক্‌ঠক্ ক'রে কাঁপছে, জুটফ্লানেলের সার্ট গায়ে, ক্ষীণদেহ, অম্বলরোগী, এই শহরেরই কোনো প্রেসের স্বল্পবেতনভোগী কর্মচারী

তারিণী দত্ত মাথা গরম ক'রে এমন কাণ্ড বাধাবে কেউ কোনোদিন কল্পনায় আনেনি।

'এই হয়,' প্রতিবেশীদের মধ্যে পরে একজন মন্তব্য করেছিলো, 'অক্ষমের এত রাগ ভালো না। প্রবল আত্মসম্মানবোধ সক্ষমের অঙ্গভূষণ, গরিবের পক্ষে তা আত্মঘাতস্বরূপ।'

তারিণী শেষ মুহূর্তে তুবড়ির মতো ফেটে পড়ছিলো রাগে।

কারো সাহায্য চাওয়া দূরে থাক্, ঠেলাওলাকে বরং ধমকাচ্ছিলো সে চিৎকার ক'রে।

'আমি বলছি, তুমি গাড়ি টানো। আমি বলছি আমি পিছন থেকে ঠেলবো, ডরো মৎ। ক'টা মোট!' কিন্তু বোঝার ভয়ে ঠেলাওলা গাড়িতে হাত ঠেকানো বন্ধ রাখেনি।

'মেরে কাঠ ক'রে দেবো।' শাসাচ্ছিলো এককড়ি ঠেলাওলাকে। 'তফাৎ থাক্।'

কাঠের মতো শক্ত হ'য়ে দাঁড়িয়ে ঠেলাওলা হাঙ্গামা দেখছিলো। বাড়ি-বদলের সময় অনেক বাবু আজকাল এরকম ফ্যাসাদে পড়ছে। হাঙ্গামার নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত দূরে দাঁড়িয়ে থাকাই নিরাপদ, অভিজ্ঞ ঠেলাওলাকে বেশি বলতে হ'লো না। তার ঠেলা তো স'রে যাচ্ছে না ও গিয়ে না হাত ঠেকানো তক্।

কিন্তু আশ্চর্য, ঠেলা সরলো, ঠেলার চাকা ন'ড়ে উঠলো।

'আমার মাল আমি নিয়ে যাবো, দেখি কোন শালা আটকায়।' তারিণী আস্তিন গুটিয়ে ঠেলার সামনের ডাণ্ডা দুটো চেপে ধরেছে। 'হ্যাঁ, তুমি পিছন থেকে ঠ্যালো; এই, তোরা সামনে আয়!'

সত্যিই তারিণীর স্ত্রী পিঠের আঁচল কোমরে বেঁধে গাড়ির পিছনে গিয়ে দাঁড়ালো, ছেলেমেয়েরা গেলো সামনে।

কোঁক ক'রে একটা শব্দ হ'লো— তারপর ঠেলাটা গড়গড় ক'রে নেমে গেলো নিচে, বড়ো রাস্তায়, উঁচু পেভমেন্ট্ ছেড়ে গিয়ে পড়লো গরম অ্যাশ্‌ফল্টে।

এককড়ি মুদি চুপ।

ঠেলাওয়ালা ও কয়লাওয়ালা হাঁ ক'রে কেবল দেখছিলো।

কেউ কিছু বললো না।

একটা গুমোট, অবিশ্বাস্যরকম স্তব্ধতা।

গাড়ি যেখানটায় দাঁড়িয়েছিলো কুকুরটা গিয়ে শূন্য জায়গাটা বার-বার শুঁকতে লাগলো।

ঠেলা মোড় ঘুরে ভিড়ের মধ্যে মিশে যেতে বৈঁচি-পরা হাত শূন্যে তুলে চিৎকার ক'রে কমলা গয়লানী তারিণীকে, তারিণীর স্ত্রীকে এবং দশটি সন্তানকে নানারকম অভিশাপ দিতে-দিতে একদিকে স'রে পড়লো।

'জেদী—' খৈ ফোটার মতো প্রতিবেশীদের মুখে কথা ফুটছিলো। 'মূর্খ।' বললো আর-একজন, 'তারিণী রাস্তায় বিজ্ঞাপন দিতে বেরোলো।'

'বিজ্ঞাপন? কিসের বিজ্ঞাপন?'

'ওই যে, একলা ঠেলতে পারছে না, বউ ছেলেমেয়েগুলোকে রাস্তায় নামালো তার সংসার-তরণীর হাল ঠেলতে।'

'বাহাদুর!' কার ঠাট্টার স্বর শোনা গেলো। 'আমাদের কাছে সাহায্য চাইতে সম্মানে বাধছিলো, এখন, এখন লোকে বলছে কি! ছি-ছি—'

'ভাবতেও পারছি না এ-পাড়ায় ও কী ক'রে এতকাল ছিলো, আমাদের মধ্যে!'

‘ঠেলা নিয়ে তারিণী বেলেঘাটায় পৌঁছুবে কখন ?’

‘কে জানে, আদৌ পৌঁছবে কিনা তা-ই বা কে জানে।’

বিকেলের পর থেকে খবর আসতে লাগলো।

না, বেলেঘাটা পর্যন্ত পৌঁছতে পারেনি তারিণী, তার আগেই অ্যাক্‌সিডেণ্ট হ’লো রাস্তায়।

‘কি রকম ?’ প্রতিবেশীরা উৎসুক।

প্রত্যক্ষদর্শী বললো, ‘কলেজ স্ট্রীট হ্যারিসন রোডের জংশন পার হবার সময় একটা ট্র্যাম এসে পড়েছিলো ঠেলার ওপর। তারিণীর ঘাড় মচ্‌কে গেছে, হাসপাতালে, বাঁচবে না বোধ হয়।’

‘আঃ,’ কেউ বললো, ‘ওই হয়, মূর্খ এমন ক’রেই মারা পড়ে।’

কিছুক্ষণের স্তব্ধতা।

একটু পরে আর-একজন এলো খবর নিয়ে। নিজের চোখে, একেবারে সামনে দাঁড়িয়ে সে দেখেছে ঘটনা।

‘শুনি শুনি।’

তারিণী আত্মহত্যা করেছে। অ্যাক্‌সিডেণ্ট তো বটেই, কিন্তু স্বেচ্ছায় সে ঘটিয়েছে তা। কি রকম ? প্রতিবেশীরা আবার উৎসুক।

‘ছেলেমেয়েগুলো ক্লান্ত হ’য়ে পড়েছিলো, হাঁটতে পারছিলো না কেউ। তারিণীর স্ত্রীও হয়রান হ’য়ে গেছে ঠেলা ঠেলতে-ঠেলতে।’

‘তারপর ?’

‘তারিণী আর-একটা ঠেলাওলাকে ডেকেছিলো কিন্তু বেনামী গাড়ির মাল নিজের গাড়িতে তুলে নিতে লোকটা রাজী হয়নি।’

‘তা তো হবেই না,’ প্রতিবেশীরা একসঙ্গে মন্তব্য করলো, ‘বেওয়ারিস মাল নিয়ে তারিণী পালাচ্ছিলো না তার প্রমাণ কি।’

প্রত্যক্ষদর্শী আস্তে-আস্তে বললো, 'রাস্তায় বউ-এর সঙ্গে কথা কাটাকাটি হয় তারিণীর। বউ শুধু বলছিলো, "এমন জিদ্ ক'রে রওনা না হ'লেও পারতে, এখন— এখন যে আর পারা যাচ্ছে না,"—সকলের ছোটোটাকে সে গাড়িতে তুলে দিয়েছিলো।'

'তারপর ?'

'তারপর আর কি, তারিণীর মাথা গরম হ'য়ে যায়। মুখিয়ে উঠে-ছিলো সে স্ত্রীকে, রাস্তায় লোক দাঁড়িয়ে গেছে, গলা ফাটিয়ে তারিণী বলছিলো বউকে, ছেলেমেয়েগুলোকে— "বেশ তো, জিরিয়ে-জিরিয়ে হাওয়া খেতে-খেতে আয় সব। দরকার নেই ঠেলা ধ'রে— আমি একলাই পারবো টেনে নিতে।" '

'তারপর ?'

'তারপর তারিণী ঠেলা নিয়ে একলা পাগলের মতো ছুটে যায়। ভিড়, ভয়ানক ভিড় ছিলো ট্র্যাফিকের তখন, একটা বাস এসে হুড়মুড় ক'রে পড়ে তারিণীর ঘাড়ের ওপর, গাড়ির ওপর।'

'পাগল, পাগল। সংসার চালাবার জন্যে তারিণী উন্মাদ হ'য়ে গিয়েছিলো।' প্রতিবেশীরা আলোচনা করছিলো।

কিন্তু ছেলেমেয়ে ও বৌকে পিছনে ফেলে তারিণী যে কেবল ডেক্‌চি-বিছানা ঘটি-বাটি লণ্ঠন ঠেলায় চাপিয়ে বাসের তলায় ছুটে গেলো, সে-খবরও ঠিক নয়।

সঠিক সংবাদ পাওয়া গেলো সন্ধ্যার পর শিয়ালদহ প্রত্যাগত এক প্রতিবেশীর নিকট। ঠেলার সঙ্গে হাঁটতে-হাঁটতে ছেলেমেয়েগুলো ক্লান্ত হ'য়ে পড়ে, একটি দুটি ক'রে তারিণী আটটিকে গাড়িতে তুলে নেয়। তারপর আর পারেনি।

'বেলেঘাটার পুলে উঠতে কষ্ট হচ্ছিলো বুঝি ?' একজন প্রশ্ন করলো।

'উঠেছিলো ঠিক।' প্রত্যক্ষদর্শীর গলার স্বর গম্ভীর হ'য়ে গেলো। 'হ'লে হবে কি। পুলে উঠতে-না-উঠতে তারিণীর স্ত্রীর পা কাঁপছে, চোখে জল এসে গেছে, বাকি দুটি সন্তানকেও ঠেলার ওপর বসিয়ে দেওয়া হয়, ইচ্ছা ক'রেই তারিণী বসিয়ে দেয়। "আর ভয় নেই,"—তারিণী বলছিলো, "এখন ঢালু পথ, ঠেলা হড়হড় ক'রে পুল থেকে নেমে যাবে। তোরা সবাই চেপে বোস।"'

'তারপর?'

প্রত্যক্ষদর্শী আস্তে-আস্তে বললো, 'বউ প্রথমটায় আপত্তি করে, কিন্তু তারিণী তা গ্রাহ্য করে না, চিরকালই জেদী একগুঁয়ে লোক, বউকে মুখ ঝামটা দেয়, বলে, "শেষটায় তুমিও শত্রুতা আরম্ভ করলে, যা বলছি শোনো, হ্যাঁ, একলাই আমি চালাবো গাড়ি, না-পারবো তো সংসার গড়েছি কেন।"'

'অর্থাৎ বউকেও ও ঠেলায় বসিয়ে দেয়, এই তো?' মৃদু হেসে হোমিওপ্যাথ হেমাঙ্গবাবু মন্তব্য করেন।

ঘাড় নেড়ে প্রত্যক্ষদর্শী বললো, 'পুল থেকে নামবার সময় ঠেলাটা হঠাৎ জোরে ঝাঁকুনি দিয়ে একদৌড়ে সামনের দিকে এগিয়ে যায়, তার ফল কি দাঁড়াতে পারে বুঝতেই পারেন।' বক্তা থামলো।

শ্রোতৃবৃন্দ নীরব।

প্রতিবেশী একজন বললো, 'তা যাবেই, এমন ভারী বোঝা নিয়ে গাড়ি একবার সামনের দিকে ঝুঁকলে আর রক্ষে থাকে! ঠেলাটা তারিণীর ওপর দিয়ে চ'লে গেছে তো? মূর্খ তারিণীর এভাবে ঘাড় ভাঙবে, বুকের হাড় ভাঙবে, আমরা ধ'রে রেখেছিলাম।'

ছেলেমেয়ে এবং তারিণীর স্ত্রীর অবস্থা কি, কোথায় তারা আছে সে-সম্বন্ধে কেউ প্রশ্ন করলো না। প্রত্যক্ষদর্শী ধীরে-ধীরে গলির অন্ধকারে মিলিয়ে গেলো।

সবাই চুপ।

চুপ থেকে কুকুরটা সকলের মুখের দিকে তাকিয়ে দ্রুত লেজ নাড়ছিলো।

হঠাৎ একজন কথা বললো, 'কিন্তু ও কি জানতো না, ঠেলা যখন ঢালু বেয়ে নামতে শুরু করে তখন তার আগে থাকতে নেই, পিছন ধ'রে চলাই নিরাপদ, সবাই তা করে।'

সে-কথার উত্তর দিতে কেউ নেই, যে যার ঘরের দিকে চ'লে গেছে। দেখা গেলো, অদূরে লম্বা টর্চ হাতে তারিণীর পরিত্যক্ত ঘরের দরজার তালা খুলতে-খুলতে বাড়িওলা নতুন কোনো-এক ভাড়াটেকে বাড়ির জলকল পায়খানা ও রসুইঘরের চমৎকার ব্যবস্থার কথা নানাভাবে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে শোনাচ্ছে।

মে য়ে - শা স ন

নীরজা মা, রুণি তার মেয়ে। নীরজার ছত্রিশ, রুণি সবে আঠারোয় পা দিয়েছে। তা হ'লেও, নীরজা সব সময়ই ভাবে, রুণি তার অংশ, তারই একটি অঙ্গ। নীরজা যদি নিজেকে কমল মনে করে, নিজের মেয়ে সম্পর্কে তার ধারণা কমলের একটি পাপ্‌ড়ি। সেই রাগ, সেই গন্ধ, সেই বিভা। নিজের সম্বন্ধে, নিজের সাজ-সজ্জা আহার-বিশ্রাম কোনোটাতেই নীরজার শিথিলতা বা অসতর্কতা নেই। তেমনি রুণির সব বিষয়ে ও জাগ্রত ও সচেতন।

এর দরুন রুণি, মুখ ফুটে বলে না যদিও, বেশ অস্বস্তি বোধ করে, মা-র এই অতি-সতর্কতায়। সর্বদা না হ'লেও কোনো-কোনো সময় মাকে সে এড়িয়ে থাকতে চায়। এমন একটা সময় আসে যখন রুণির নিজের মনে চুপচাপ ব'সে থাকতে, শুয়ে থাকতে বা অসময়ে শোয়া ও বসা যদি দোষাবহ হয় অন্তত কোলে একটা বই নিয়ে জানলার বাইরে তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছা করে। এ-ধরনের ইচ্ছা কার না হয়।

কিন্তু সেই ইচ্ছা রুণি মা-র জন্যে খাটাতে পারে না। সংসারের দশ কাজ ফেলে নীরজা কোথা থেকে ছুটে এসে বলবে, 'যদি না পড়ছো বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াও।'

'এখান থেকে মেঘগুলো সুন্দর দেখা যাচ্ছে মা।' রুণিও অসম্ভব সুন্দর-ভাবে হেসে উত্তর দিতে চেষ্টা করবে। কিন্তু নীরজার মুখ তার আগেই অন্ধকার হ'য়ে যাবে। 'মেঘ দেখার এত কি আছে, মেঘের দিকে হাঁ ক'রে তাকিয়ে থাকার অর্থ, এতটা বয়েস হ'লো আমার, আমি এখনো বুঝি না।'

রুণির বুকের ভিতরটা মেঘের মতো অন্ধকার হ'য়ে যাবে। কোলের খোলা বইয়ের পাতায় ও চোখ নামাতে চেষ্টা করবে যদিও। কিন্তু নীরজা সেখানে থামবে কি, থামবে না।

'কলেজে আজ টিফিন খেয়েছিলে ?'

'হুঁ।'

'কি বই ওটা ?' নীরজা রুণির কোলের ওপর গলা বাড়িয়ে দেখবে।

'সিভিক্‌স।' রুণি উত্তর দেবে।

পর-পর দুটো কথার জবাবই যখন রুণি মুখ না তুলে দেবে তখন নীরজা যে আরো কী ভয়ানক চ'টে যাবে, কেমন চেহারা হবে, রুণি ছাড়া আর এত বেশি কে জানে, কে দেখেছে। কে আছে নীরজার এত কাছে। রুণি ভাবে। 'বলছিলাম সামনে এগ্‌জামিন নেই। কলেজ থেকে এসেই ঘরে ব'সে বই নিয়ে বসা কেন। কি এমন এই অবেলায় পড়ার মতো বই সিভিক্‌স। রেখে দাও। কর্তা পার্কে গেলেন, সঙ্গে যখন গেলে না বারান্দায় গিয়ে হাঁটো একটু। স্বাস্থ্য দেখতে হবে।'

রুণি চুপ ক'রে বই রেখে বারান্দায় যাবার জন্য প্রস্তুত হবে।

রোজ বাবার সঙ্গে বেড়াতে যেতে ভালো লাগে না, ম'রে গেলেও বলার সাহস হয়নি রুণির এতদিন। তাই চুপ ক'রে থাকবে।

'টিফিন খেয়েছিলে ?' নীরজা প্রশ্ন করবে।

'হ্যাঁ।' রুণি এবার হয়তো মা-র মুখের দিকে তাকাবে।

'ওটা কি ?' রুণির পড়ার টেবিলের ওপর নুয়ে প'ড়ে নীরজা ক্ষিপ্র-গতিতে খাতা ও বইয়ের গাদার তলা থেকে কি-একটা যেন টেনে বার করলো।

'ওটা গত সপ্তাহের "মাঙ্গলিক"।'

রুণি তাড়াতাড়ি বলতে চেষ্টা করবে।

কিন্তু নিজের চোখে পত্রিকাটির প্রকাশের সন তারিখ বার ক'রে পরীক্ষা না করা তক্ নীরজা কাগজটা কিছুতেই হাত থেকে নামাবে না। শূন্যে তুলে রাখবে। 'টিফিনের পয়সা বাঁচিয়ে ও-সব ছাইভস্ম তুমি কিনবে না, আমি আবারও সাবধান ক'রে দিলাম।' ব'লে কাগজটা তাচ্ছিল্যভরে টেবিলের এক পাশে সরিয়ে রাখবে। রুণি ঘাড় নাড়লো, কথা বললো না।

'আগে স্বাস্থ্য, তারপর সব।' নীরজা রুণির এলোমেলো হ'য়ে থাকা বই ও কাগজগুলি গুছোতে থাকবে। 'আমি মা, আমি জানি কি তোমার ভালো, কোনটা মন্দ। আমার কথা না শুনলে গোল্লায় যাবে। আবারও ব'লে দিচ্ছি। স্বাস্থ্য রূপ যৌবন নারীত্ব কিছুই থাকবে না।'

'আমি কি জানি না, আমি কি শুনিনি তোমার কথা।' দেয়ালের দিকে চোখ ফিরিয়ে অভিমানাহত গলায় রুণি এবার হয়তো উত্তর দিতে চেষ্টা করবে।

নীরজা গলা নরম ক'রে বলবে, 'তবে ওঠো, একলা এমন অসময়ে ঘরেব ভিতর চুপ ক'রে ব'সে থাকে না। পড়ছিলে না, ভাবছিলে। আমি তোমার বসা দেখেই তা টের পেলাম। চৌকাঠের ওপার থেকেই লক্ষ্য করেছি। মেঘ, মেঘ তুমি দেখছিলে না।'

হঠাৎ আবার এ-কথা এসে পড়াতে রুণি থ' হ'য়ে যায়।

মাকে কোনো কথা ব'লে বিশ্বাস করানো শক্ত। রুণি জানে, তাই চুপ ক'রে রইলো।

আর অভিমান না, রুক্ষ গাম্ভীর্য ফুটে উঠলো ওর চোখে মুখে ভুরুতে।

এবং মেয়ের মুখের এই ভাব দেখলে নীরজা আরো কী ভীষণ মূর্তি ধরবে রুণির তা-ও অজানা থাকে না ব'লে তাড়াতাড়ি ছুটে যায় খোলা বারান্দায়।

নীরজা সেখানে পর্যন্ত ধাওয়া করে।

'আমি মা, দশ মাস পেটে রেখে হৃদপিণ্ডের তাপ দিয়ে চাপ দিয়ে তোমার এই মূর্তি দিয়েছি। কিন্তু মা-র কর্তব্য ফুরোয় কি ? ফুরোয় না। তোমার আঠারো বছর আমার চোখে কিছুই না। এখনো কুঁড়ি, ফোটার, সবটুকু জীবন আরম্ভ হবার ঢের দেরি, সুতরাং—'

আশ্চর্য, রুপোলী বর্ডার দেওয়া কালো রুমালের মতো সুন্দর একটা মেঘ দেখতে গিয়ে রুণির তা দেখা হ'লো না, তাকাতে হ'লো মা-র চোখের দিকে। 'তুমি কি আমার কথা—'

কিন্তু রুণির কোনো কথাই কানে না তুলে নীরজা গলার স্বর অপরিবর্তিত রেখে বলতে লাগলো, 'সুতরাং আমার কাছে কিছু গোপন করবে না, করলে নিজেই ঠকবে, মরবে, আমি জানি কিসে তোমার ভালো—'

পান্নালাল, রুণির বাবা এসে রুণিকে তার সেই অসহায় অবস্থা থেকে সেদিন রক্ষা করে। ইতিমধ্যে বেড়ানো শেষ ক'রে ফিরে এসেছে, না কি বেড়াতে না গিয়ে বাজারে গিয়েছিলো। হাতে প্রকাণ্ড একটা ইলিশ মাছ। চকচকে রুপালী মাছটা বাবার হাত থেকে কেড়ে নিয়ে রুণি খুশি গলায় বললো, 'ইস্, কী সুন্দর মাছ বাবা।'

কাজেই নীরজাকেও গলার স্বর বদলাতে হয়। বড়ো-বড়ো চোখে স্বামীর দিকে তাকিয়ে বললো, 'অসময়ে হঠাৎ এত বড়ো মাছ ?'

'ঠাণ্ডা দিন। ইলিশ মাছ ভাজা আর খিচুড়ি চালাও রাত্রে। বেশ লাগবে। কেমন রে, ভালো লাগবে না রুণি ?' পান্নালাল স্ত্রীর দিকে না তাকিয়ে মেয়েকে ছাখে।

'হ্যাঁ বাবা, হ্যাঁ মা।' চোখে ঝিলিক এনে রুণি আবদারে ফেটে পড়তে চাইলো। মা-র কাছে এসে ঘেঁষে দাঁড়ালো। 'অনেকদিন ইলিশ মাছ ভাজা খিচুড়ি খাইনি মা।'

'বেশ তো, তাই হবে, খাবি।'

নীরজা অনেকটা নিশ্চিন্ত হয়।

বলতে কি, রুণি যখন কিছু খেতে কি পরতে আবদার করে তখন নীরজার দুশ্চিন্তা থাকে না। আট বছর আগে ও এমনভাবে মা-র কাছে খেতে চেয়েছে। কিছু খাওয়ার ইচ্ছা হ'লে জানিয়েছে। আজও মাঝে-মাঝে চায়, তখন নীরজা মেয়েকে নিজের কাছে পায়। মনে হয় না রুণি বদলাচ্ছে, অন্য কেউ হ'য়ে যাচ্ছে। রুণি— তার সেই রুণি আছে।

'আমি মাছ কুটবো মা।'

প্রসন্ন গলায় নীরজা বললো, 'কুটবে। লেখাপড়া ঘরকন্না দুটোই শিখতে হবে তোমাকে, মেয়ে হয়েছো যখন।'

মাছ কুটতে শেখা, ভাজতে শেখা, খাওয়া, গল্প ও সবচেয়ে উপভোগ্য বাবার হাসির মাঝখানে নীরজার হঠাৎ 'আর-এক টুকরো মাছ দিই, আর-এক চামচ খিচুড়ি নে রুণি। মানে? দিন-দিন তোমার খাওয়া ক'মে যাচ্ছে এটা আমি বেশ লক্ষ্য করছি।' মা-র হুঁশিয়ারি শুনে রুণির বুকের ভিতর ঢিব্ ক'রে ওঠে। তথাপি মা-র চোখে যতদূর পারে হাসি জ্বেলে মা-র কথার জবাব দিলে ও, 'বাপ্স, আর খেলে আমি বাঁচবো না মা। ইস্, এত তেল বাবা তোমার মাছে, আমার মুখ মেরে দিয়েছে।'

'গঙ্গার ইলিশ।' মেয়েব চোখে চোখ রেখে পান্নালাল মৃদুমন্দ হাসে।

'আমি আর পারছি না বাবা।'

চোখে হাসি রুণির, কিন্তু চোখ সজল। মেয়ের পাতে আরো দুটো ভাজা ফেলে দিতে নীরজা উন্মুখ।

যেন মাকে এ-কাজ থেকে নিবৃত্ত করতে পারছিলো না ব'লে রুণি বাবার দিকে তাকিয়ে ছিলো।

'থাক্‌-থাক্‌। চাইছে না যখন খেতে, পারছে না যখন—' পান্নালালকে কথাটা শেষ করতে না দিয়ে নীরজা মেয়ের পাতে মাছ ফেলে দিলে।

'আমি কারোর কোনো কথা শুনতে চাই না। আমি জানি ক'টুকরো ইলিশ খেলে তেলে মুখ মেরে আনে, ক'চামচ ভাত খেলে তবে পেট ফাটে। ওর বয়েস আমার ছিলো, আমিও একদিন ও-রকম ছিলাম। কিন্তু হবে কি। গালের চামড়া শুকিয়ে যাবে, চোখ গর্তে ঢুকবে। তোমার শরীর ধ্বংস হবে, এই খেয়ালপনার প্রশ্রয় আমি দেবো না।'

মুখ নিচু ক'রে রুণি মাছের কাঁটা খোঁটে, গরম খিচুড়ি আঙুল দিয়ে নাড়াচাড়া করে। ওর গৌরবর্ণ আঙুল টুকটুকে লাল হ'য়ে যায় তাপে।

'চিরকাল তোমায় খাইয়ে এসেছি। কতটা ভাত খেলে পেট ভরবে আমি জানি না? ক'দিন যাবত লক্ষ্য করছি খাওয়া একদম ক'মে গেছে তোমার, কেন এমন হচ্ছে তার জবাব দেবে কি?'

রুণি মা-র মুখের দিকে তাকাতে পারেনি।

পরা।

'না, না, এ-ব্লাউজ আমি কিছুতেই তোমার গায়ে দেখতে চাই না।'

নীরজা অন্য কাজ ফেলে ছুটে আসবে।

'কেন, এক মাস আগে ধুয়ে এসেছে, তারপর একদিন তো গায়ে দেওয়া হয়নি।' রুণির উত্তর।

'না-দিয়েছো ছুটির দিন বাড়িতে গায়ে দিয়ে ছিঁড়ে ফেলো।' ব'লে নীরজা ভিজে হাত আঁচলে মুছে রুণির স্যুটকেস হাঁটকে কালোর ওপর শাদা বুটি তোলা জামা বার করে।

মুখ শুকনো ক'রে রুণি গায়ের জামা খুলে জামা পরলো।

পাছে নীরজার চোখ যায় তাই সে আগেই ব'লে ফেললে, 'কালো ব্লাউজের সঙ্গে কমলা রংটা এখন ভালোই লাগছে মা।'

'তা তুমি বলবে আমি জানি।' রুণির পরনের শাড়িটার দিকে বিষ-নয়নে তাকিয়ে নীরজা হলুদ ও কালোয় ছোপানো ভাঁজ-করা একটি শাড়ি বাক্স থেকে টেনে বার করলো।

'আজ এটা।'

মুখ কালো ক'রে অগত্যা পরনের শাড়ি ফেলে রুণি সেই শাড়ি পরলো।

'ন'মাস, ছ'মাস আগেও তুমি এমন ছিলে না। একটু সেজেগুজে থাকতেই বরং চেয়েছো। আজ হঠাৎ এই জামা কাপড়-সম্পর্কে উদাসীন অবহেলার কোনো অর্থ খুঁজে পাই না আমি।'

'একটাও তো খারাপ ছিলো না মা।'

'কোনটা খারাপ কোনটা ভালো তুমি তা আমায় শিখিয়ো না। যেমনটি বলবো করবে, পরবে।'

রুণির খারাপ লাগছিলো আরো বেশি ড্রাইভারটা কি ভাবছে ভেবে। এ-বাড়ির মেয়েদের তুলে নিতে এসে তার সবচেয়ে বেশি সময় নষ্ট হয়। কী অন্যায় কথা।

রুণি গাড়িতে না ঢুকতে আর-দশটা মেয়ে ফোঁসফাঁস ক'রে অভিযোগ করবে।

রুণি আজ আর বলতে পারবে না কাপড় পরতে দেরি হ'য়ে গেলো, কেননা, কলেজে বেরোচ্ছে দিন থেকে আজ অবধি এক শ' বার এ-কথা ব'লে সে গাড়ির মেয়েদের কাছে ক্ষমা চেয়েছে। ব'সে থেকে-থেকে রোজ ওদের হাঁটুতে ব্যথা ধ'রে যায় রুণি দেবী কি এ-কথা মনে রাখতে পারেন না।

রোজ এ-রকম হ'তে থাকলে রুণিকে ট্র্যামে-বাসেই কলেজে যেতে

হবে। মানে কলেজের কর্তারাই এ-বাড়ির মেয়েকে নিতে গাড়ি পাঠাতে আপত্তি করবে।

তখন, তখন মা-র শিক্ষা হয় কিনা— শাড়ি পরা শেষ ক'রে নীরজার-হাতে-ধ'রে-রাখা পাউডারের পাফ্ তুলে নিয়ে গলায় ও মুখে চাপড়াতে-চাপড়াতে রুণি আয়নায় নিজেকে দেখলো আর ঠোঁট টিপে হাসলো।

'কী সুন্দর দেখাচ্ছে এখন!' নীরজার দুই চোখ ঝলমলিয়ে উঠলো। 'টিফিন খেয়ো।'

রুণি ঘাড় নাড়লো।

তারপর একটা বই ও একটা একসারসাইজ খাতা হাতে নিয়ে বেরিয়ে গেলো।

'আমার মনে হয় ও কলেজে যাচ্ছে না, তুমি যাচ্ছো।'

নীরজা পান্নালালের ঠাট্টা গায়ে মাখলো না।

'আচ্ছা, রুণি এই দু-চারদিনের মধ্যেই কেমন-একটু আনমনা উদাসীন হ'য়ে গেছে ব'লে তোমার মনে হয় না?'

'তোমার দেখার ভুল।' পান্নালাল স্ত্রীর কথা গায়ে না মেখে সিগারেট ধরায়। 'ও ঠিকই আছে। আসলে তুমি বাড়াবাড়ি করতে গিয়ে সব গুলিয়ে ফেলছো। ওর খাওয়া পরা, কলেজে যাওয়া, কলেজ থেকে ফিরে এলে পর বেড়ানো, পড়তে বসার মধ্যে আমি কোনো অন্যমনস্কতা, উদাসীনতা দেখছি না।'

পান্নালালের এই বোঝানো গায়ে না মেখে নীরজা কক্ষান্তরে চ'লে গেলো। 'তুমি বুঝবে না। মেয়ে নও। আমি মেয়ে। আঠারো বছরের মন নিয়ে আমিও ক'দিন পৃথিবীতে বেঁচে ছিলাম।'

ভাবতে-ভাবতে নীরজা রুণির বিছানার পুরোনো চাদর তুলে ফেলে আজ-সকালে-ধুয়ে-আসা ফর্সা বেডকভারটা বিছিয়ে দিলে। টেবিলক্লথ

পালটালো। বইগুলো আবার গুছোলো। 'সাত দিনেও মেয়ে এগুলো বদলাবে না, এমন স্বভাব হয়েছে।' মনে-মনে মেয়েকে বেশ-একটু ব'কে নীরজা রুণির বিছানায় শুয়ে পড়লো। পান্নালাল অফিসে বেরিয়ে যেতে নীরজার আর হাতে কোনো কাজ থাকে না ব'লে এ-সময়টা রুণির বিছানায় বেশ একটু সময় ঘুমিয়ে নেয়, গড়িয়ে নেয় এবং রুণিকেও ভাবে।

রুণিকে যে নীরজা কত ভালোবাসে, ওর কতটা নিকটে দাঁড়িয়ে আছে তার গর্ভধারিণী, রুণির গায়ের গন্ধমাখা কোল-বালিশটা বুকে টেনে নিয়ে, যেন মেয়ের গায়ের গন্ধ ভালো একটা কোনো জিনিসের শিশি-র ভিতরের গন্ধের মতো শুঁকতে-শুঁকতে নীরজা ঘুমে বেহুঁশ হ'য়ে পড়লো।

নীরজা স্বপ্নের মধ্যে রুণিকেই ছাখে। মা-র কাছে একটা-কিছু লুকোচ্ছে রুণি। এ-ধরনের দৃশ্য নীরজা যখন স্বপ্নেও দেখলো তখন তার ঘুমন্ত দুই চোখের কোনায় অভিমানের দুই বিন্দু অশ্রুই দেখা গেলো।

ঘুমোলে মানুষ অসহায় হ'য়ে যায়, জাগ্রত অবস্থায় যা সে রাগ দিয়ে ধমক দিয়ে ঢেকে রাখে ঘুমোলে আর সে তখন তা পারে না। তখন অসহায় হ'য়ে কাঁদে। কিছুতেই তো পারবে না নীরজা রুণির মনের ভিতর ঢুকতে।

একটা অজানা ফুলের কলি অজানা গন্ধ বুকে আটকে রেখে বড়ো হচ্ছে, ফুটতে তৈরি হচ্ছে।

এই দৃশ্য দেখতে নীরজার ভালোও লাগে, কান্নাও পায়।

'কত যত্নে আগলে রেখে-রেখে এই রুণিকে পরিণত অবস্থায় পৌঁছুতে সাহায্য করছে মা, তুই বুঝবি না রুণি, সেইজন্যেই বলে পেটের শত্রু।'

এক ঘণ্টার ক্লাশ ক'রে রুণি বাড়িতে ফিরে এসেছে, এমন দিনও হয়। কলেজের বাড়িটা গমগম ক'রে উঠতে না উঠতে ফাঁকা হ'য়ে যায়

এমন দুর্ঘটনা ও তার দরুন আকস্মিক ছুটি প্রতি মাসেই একটা-দুটো কলকাতার স্কুল-কলেজগুলোতে লেগে আছে।

আর এই দিনগুলিকেই রুণির ভয় বেশি!

কেননা নীরজা আয়নার মতো মুখের সামনে দাঁড়িয়ে থেকে রুণিকে প্রশ্ন করবে ডজন-ডজন।

মা-র এক-একদিন দুপুরে তার সিঙ্গল্ খাটের ওপর এলোমেলো চুল ছড়িয়ে হাত-পা অসাড়ের মতো ক'রে ছড়িয়ে রেখে ঘুমিয়ে থাকা, না-স্নান না-খাওয়ার বিশৃঙ্খল দৃশ্য রুণির চোখকে আজকাল বেশ পীড়িত করে।

তারপর রুণির পায়ের শব্দে স্প্রিং-এর মতো লাফিয়ে নীরজার উঠে বসা ও নতুন শান-দেওয়া ছুরির ফলার মতো চকচকে চোখে তাকিয়ে রুণিকে প্রশ্নে-প্রশ্নে শতখান করা, নীরজার একটা রোগ হ'য়ে দাঁড়িয়েছে।

'কলেজের গাড়িই আবার পৌঁছে দিয়েছে তো বাড়ি? না কি টিফিনের সবটা পয়সা খরচ ক'রে ট্র্যামে-বাসে চ'লে এলি?'

'ট্র্যামে-বাসে এলে কি আর এখুনি হুট্ ক'রে এসে তোমার সামনে দাঁড়াতে পারতাম। সেই তিনটে বাজতো।'

'কলেজটা ভালো।' নীরজা রুণির টেবিল থেকে ছোট্টো আয়না তুলে নিজের মুখখানা একবার দেখলো, দেখে বললো, 'ইচ্ছে ক'রেই তোমায় আমি এ-কলেজটায় দিলাম।'

রুণি চুপ।

'ক'জন ভর্তি হয়েছে তোদের সঙ্গে ফার্স্ট ইয়ারে?'

'অনেক, অনেক মেয়ে, সে কি আর আঙুল দিয়ে গুনে আমি শেষ করতে পারবো মা?' বেশ শুকনো মুখে রুণি হাতের বই ও খাতাটা টেবিলের ওপর নামিয়ে রাখলো। মা-র এখন এই ঘরে দীর্ঘ অবস্থান কি ক'রে এড়ানো যাবে ভেবে-ভেবে রুণি এতটুকু হ'যে গেলো।

হ্যাঁ, বলতে কি, রুণি বাড়ি ফেরার পথে হঠাৎ ছুটি হ'য়ে যাওয়া এই মেঘ-মেঘ শ্রাবণ দুপুরে তার সুন্দর ছোট্টো পড়ার ঘরের দরজায় খিল দিয়ে ব'সে একটা ভালো উপন্যাস পড়বে, কি এক বন্ধুর কাছে চিঠি লিখবে, কি কিছুই না ক'রে মেঘের দিকে তাকিয়ে মন খারাপ ক'রে অন্তত কিছুটা সময় সুন্দরভাবে কাটিয়ে দেবে ভাবছিলো, তা আর হ'লো না, সব ভেঙে গেলো মা-র জন্যে। নীরজা ওর এমন দুপুরটা মাটি করবার জন্যই যেন না-স্নান না-খাওয়া চেহারায় আগে থাকতেই তৈরি হ'য়ে এসে ব'সে ছিলো এ-ঘরে।

রুণি কাপড় ছাড়তে আলনার কাছে স'রে গেলো।

নীরজা ডাকলো, 'শোন, ইদিকে আয়।' রুণি কাপড় না খুঁজে আবার মা-র সামনে এসে দাঁড়ায়।

'তোদের ক'জন টিচার?'

'হবে বারো-তেরো জন, সবাইকে তো দেখিনি, এখনো ভালো ক'রে সবার ক্লাস আরম্ভ হয়নি।'

রুণি আলনার কাছে ফিরে যেতে চেয়েছিলো। নীরজা হাতে ধ'রে টেনে মেয়েকে নিজের কোলের উপর নিয়ে এলো।

'উঃ, ছাড়ো, বড্ডো লাগে মা, তুমি যখন-তখন কথাবার্তা নেই হাতে গলায় ধ'রে এমনভাবে টানো!'

'উঃ, এতজোরে তোকে টানলাম যে চোখে জলই এসে গেলো! এমন জোরে আমি হাতে মোচড় দিয়েছি?'

খর-শাসনের দৃষ্টি ঝকঝকে ক'রে নীরজা গর্ভজাত একটা মেয়ের ভিতর পর্যন্ত দেখতে লাগলো।

রুণি কাঁদতে গিয়েও কাঁদলো না।

শুধু মুখভার ক'রে মুখ ফিরিয়ে আলনার দিকে তাকিয়ে অসহায়

চোখে কাপড় ছেড়ে এখন কোন শাড়িটা পরে, কোন সায়া, খুঁজতে লাগলো।

'এক্ষুনি দরকার কি কাপড়টা ছেড়ে। ভালো লাগছে, ভালো দেখাচ্ছে এমন, থাক না কতক্ষণ। কাল না-হয় আর-একটা বার করবি।'

অর্থাৎ শাড়ি খুঁজে নীরজাকে এড়াবার উপায় নেই— রুণিকে মনে করিয়ে দিতেও মা দ্বিধাবোধ করলো না।

অগত্যা রুণি আলনার দিকে স'রে যাওয়ার চেষ্টা ত্যাগ করলো।

'গুচ্ছের মেয়ে গিয়ে তো এক জায়গায় জড়ো হয়েছিস, অ্যাদ্দিনেও আলোচনা হ'লো না নিজেদের মধ্যে তোদের মধ্যে দেখতে কে বেশি সুন্দর?'

মা-র মুখের ঘড়িতে রাগ বিরক্তি ও ঠাট্টার কাঁটাগুলো যে বড্ডো বেশি চঞ্চল হ'যে নড়াচড়া করে, এটা রুণি ইদানীং বেশ লক্ষ্য করেছে।

তাই নিজে একটু চঞ্চল না হ'য়ে গম্ভীরভাবে ঘাড় নেড়ে বললো, 'হ্যাঁ হয়েছে, মেয়েরা বলেনি এখনো কেউ, ইংরেজির টিচার বলেছেন, ডলি সেন।'

'কোথাকার মেয়ে, কাদের মেয়ে রে?'

'তা তো জানি না, সাউথ থেকে বাসে ক'রে আসে।'

'তবে বড়োলোক না, গরিবের মেয়ে হবে। তোদের ক'জনকে প্রাইভেট গাড়ি কলেজে দিয়ে যায়?'

'অনেক, সে কি আর একটা-দুটো মোটরগাড়ি!'

নীরজা চুপ ক'রে রইলো।

রুণি বললো, 'তুমি খাবে না মা?'

নীরজা তারও উত্তর দিলে না।

'তোদের ডলি সেনকে সব চেয়ে সুন্দর ব'লে দিলে ইংরেজির টিচার, তিনি কে ? তাঁর নাম কি ?'

'আইভি মল্লিক।'

'বা-রে নামের কী বাহার! না, কলেজটা আগে আরো ভালো ছিলো, টিচারগুলো আরও বুড়োটুড়ো থাকতো, যাক—' নীরজা আইভি মল্লিক সম্পর্কে প্রশ্ন ছেড়ে দিয়ে বললো, 'তোর চেয়ে ফর্সা ডলি ?'

অন্যদিকে তাকিয়ে রুণা বললো, 'অনেক।'

এই 'অনেক'-এর মধ্যে মেয়ের রাগ কতটা আছে তার পরিমাণ করতে নীরজার কষ্ট হ'লো না।

এবং যেন অনায়াসে ডলি সেনের প্রসঙ্গটাও সদ্য ঘুমভাঙার আলস্য থেকে বিরাট একটা হাই তুলে ঝেড়ে ফেলে দেওয়ার মতো গলা ক'রে নীরজা বললো, 'কি খাবি এখন দুপুরে ?'

'আমার খিদে পায়নি।'

'আমারও খিদেটিদে নেই, আকাশ এমন মেঘ-মেঘ ক'রে আছে, তাই পেটটাও কেমন গুম্ মেরে আছে।'

হঠাৎ নীরজার গলার স্বর বেশ হাল্‌কা হ'য়ে গেলো।

অর্থাৎ ততটা সে আর মা হ'য়ে রইলো না।

না হ'লে, নিজের খিদে নেই তো নেই, রুণির খিদে নেই শুনলেই সে রেগে জ্ব'লে উঠতো।

'কি সব অদ্ভুত কথা শুনি। তোর আজকাল এমন খিদে পায় না কেন ?' কিন্তু এখন রাগ না হ'য়ে বরং আদুরে গলায় নীরজা প্রস্তাব করলো, 'আমার মনিব্যাগ খুলে একটা আধুলি নিয়ে তুই একবার বরং নিচে যা। চা আর গরম চানাচুর ভাজা নিয়ে আয় গিয়ে। দু-জনে ব'সে তাই খাই। একটা বাজে, তোরও তো চা-এর সময় হ'য়ে এলো।'

চা-চানাচুর বাদলা দুপুরে রুণির প্রিয় সঙ্গী এবং রুণির বয়সের সব মেয়েদেরই। কমনরুমে আজ দুপুরে গোল হ'য়ে ব'সে সবাই ওরা ওই দিয়ে টিফিন সারতো।

এখন ঘরে মা-র সঙ্গে ব'সে চা-চানাচুর খাওয়া। আর সারা দুপুর আলপিনের খোঁচা খাওয়ার মতো ওর প্রশ্নের খোঁচা খাওয়া।

রুণির মরে যেতে ইচ্ছে হচ্ছিলো। রুণির ইচ্ছে করছিলো না একবার সিঁড়ির নিচে গিয়ে আর ওপরে উঠে আসে।

কিন্তু উপায় নেই। মা-র খপ্পর থেকে যে তার শিগ্‌গির মুক্তি পাবার সম্ভাবনা আছে তা-ও না।

দেয়ালে রুণির একটা বালিশ ঠেকিয়ে তাতে পিঠ ঠেসান দিয়ে নীরজা বাকি দুপুরটার জন্যে যেন কায়েমি হ'য়ে বসলো এ-ঘরে।

রুণির হাত থেকে চা-ভর্তি প্রকাণ্ড কাচের গ্লাসটা তুলে নিয়ে নীরজা অল্প হাসলো। 'তুই, তোর বাবা বেরিয়ে গেলে সত্যি আমার আর সময় কাটতে চায় না। কি করি আর তখন একলা-একলা। তোর বিছানায় কতক্ষণ ঘুমিয়ে নিই।'

রুণি কথা না ক'য়ে নিজের চায়ে চুমুক দেয়।

'তোদের আইভিদি'র বিয়ে হয়েছে ?'

'না।'

'কি রকম বয়েস হবে রে ?'

'এই তোমার মতোন, তোমার চেয়ে একটু বড়োও হ'তে পারে।' রুণি মা-র চোখে চোখ রাখলো। নীরজার চোখে হাসির একটা সুন্দর আভা ফুটে উঠতে দেখে ও খানিকটা আশ্বস্ত হ'লো তবু।

'তোর বাপ তো রাতদিন আমায় ঠাট্টা করে বুড়ি হ'য়ে গেছি ব'লে। অথচ এই বয়সের কত মেয়ে আছে এখনো বিয়ে করেনি।'

রুণির ইংরেজি টিচার আইভি মল্লিক আর বিয়ে করবে কিনা এবং রুণি সে-সম্পর্কে কিছু শুনেছে কিনা নীরজা জিগ্যেস করলো না।

কিন্তু না করলেও কি মা চুপ ছিলো। ডলির মা আছে? কেমন দেখতে? রুণি বা তার সহপাঠিনীদের মধ্যে কেউ কি দেখেছে মহিলাকে? 'আইভি মল্লিকের চোখে ডলি সুন্দর, কিন্তু তোদের, তোরা কাকে সবচেয়ে সুন্দরী ব'লে সাব্যস্ত করলি, না কি এখনো আলোচনা হয়নি, গুচ্ছের মেয়ে গিয়ে তো জড়ো হয়েছিস এক জায়গায়।'

মেয়ে যেটুকুন জানে, চোখে দেখছে, তাই নিয়েই নীরজার কৌতূহলের সীমা নেই, আর ওর জানা ও দেখার বাইরে যে-সময়, যে-স্থান অর্থাৎ রুণি যে-সময়টা কলেজে কাটিয়ে আসে তা জানতে দেখতে নীরজার আগ্রহ উৎসাহ কম কি।

রুণি একটা-একটা ক'রে মা-র প্রশ্নের উত্তর দিয়ে গেলো। মুখে উত্তর দিলে কিন্তু তার বুকের ভিতর হুহু করছিলো। মা কি বেরোবে না, মা-র কি আর অন্য কাজ নেই। তার এমন সুন্দর ছুটির দুপুর, এমন নিরিবিলি ছোট্টো ঘর, জানলা, জানলার ওপারে আকাশ, আর আকাশ ভ'রে হাতির বাচ্চার মতো নধর সুন্দর মেঘগুলো খামোকা ছুটোছুটি ক'রে মরলো।

কোনো কাজেই লাগাতে পারলো না রুণি। সব, সব তার মাটি হ'য়ে গেলো, ম'রে গেলো মা-র জন্যে। রুণির চোখে জল এসে গিয়েছিলো।

'কি ভাবছিস?'

'কই না তো।' ধরা প'ড়ে গিয়ে রুণির মুখ শুকিয়ে গেলো। 'ভাজার লঙ্কাটা বড্ডো ঝাল, চোখে জল এসে গেছে মা।' শুকনো মুখ রুণি আরো বিকৃত করলো।

'হ্যাঁ-রে, আসল কথাই আজ অবধি জিগ্যেস করা হ'লো না, রোজ ভাবছি জিগ্যেস করবো।'

'কি ?'

'রাজ্যের কুমারী মেয়ে গিয়ে তো ঠাঁই নিয়েছিস একটা বাড়িতে। তোদের মধ্যে কি এমন একটিও নেই যার বিয়ে হয়েছে। আজকাল তো কত বউ-ঝিরা কলেজে যায়। লেখাপড়া শিখতে নয়, বাড়ির প্রেস্টিজ বজায় রাখতে। ক'জন বউ ভর্তি হ'লো তোদের সঙ্গে ?'

'অনেক, অনেক মা।' রুণির গলার স্বর উদাস হ'য়ে গেলো। 'কারো-কারো বেশ বড়ো-বড়ো ছেলেমেয়ে আছে।'

'তা তো থাকবেই।' গম্ভীর গলায় কথাটা শেষ ক'রে নীরজা দেয়ালের দিকে চোখ ফেরালো।

'কোনো বউ-এর সঙ্গে তোর বন্ধুত্ব হয়েছে কি ?'

'না।' রুণি রাগে চোখমুখ কটমট ক'রে দেয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে নীরজার কথার উত্তর দিলে।

'কলেজ অবধি আমি তোমার পিছু ধাওয়া করবো না। যে-সময়টা তোমাকে দেখলাম না সেই সময়টার জন্যে মুখে সদুপদেশ দেওয়া ছাড়া উপায় নেই।'

রুণির দুই কান গরম হ'য়ে উঠতে লাগলো। এতক্ষণ তবু-বা নীরজা গল্প করছিলো, আরো একপ্রস্থ চা ও চিনাবাদাম আনিয়ে এইমাত্র একলাই সেগুলো সাবাড় ক'রে মেঝের ওপর দুই পা ছড়িয়ে ব'সে নিজে আলুথালু মাথা হ'য়ে অত্যন্ত নিপুণ হাতে মেয়ের চুল বাঁধছিলো।

রুণির ছুটির দিনটা এ-ভাবে ভণ্ডুল করতে মা উঠে-প'ড়ে লেগেছে, ভাবতে-ভাবতে রুণি নীরজাকে এক অনুকম্পা করা ছাড়া আর কি করতে পারে।

মাকে রুণি অনুকম্পা করছিলো।

সুতরাং কতকগুলো বাচ্চা বউ-এর সঙ্গে কলেজে আড্ডা মারলে এবং

তাদের সঙ্গে প্রতিনিয়ত মেলামেশা ও আলোচনা করলে তার প্রভাব রুণির কচি মন ও ফুটন্ত শরীরের ওপর এমন রাতারাতি এসে যাবে যে, পরে আর শত মাথা কুটে মরলেও এই ভুলের সংশোধন হবে না।

'পড়াশোনা এক জিনিস, সেক্স্ অন্য।'

কে বলতে পারে, কালই হয়তো রাস্তায় কোনো ছেলে দেখে ভুলে গিয়ে বিয়ে-বিয়ে ক'রে মাথা খারাপ ক'রে রুণি একটা অদ্ভুত কেলেঙ্কারী বাধাবে।

মা-র মন যে কত নিচু, রুণি ভাবলো, ভাবলো আর মুখ বুজে কানের কাছে চরকার ঘ্যানর-ঘ্যানর শব্দের মতো নীরজার হিতোপদেশ শুনতে লাগলো।

না, সবচেয়ে তার কষ্ট হচ্ছিলো, দুপুরটা তো মাটি হ'লোই, রুণির এমন মোলায়েম মেঘলা বিকেলটা পর্যন্ত নীরজা নিষ্ঠুর হাতে কেড়ে নিলে। কী না হ'তো, কী না করতে পারতো ও, এখন যদি মা ঘরে না থাকতো। রুণি একটা ভালো বই পড়তো, চিঠি লিখতো কোনো বন্ধুর কাছে। বই পড়া ও চিঠি লেখায় মন না বসলে একলা চুপচাপ জানলার কাছে চেয়ারটা টেনে নিয়ে এই নির্জন প্রায়ান্ধকার ঘরে— আহা, কত সম্ভাবনা ছিলো এই একটি সন্ধ্যার। রুণির চোখে জল এলো।

'কাঁদছিস নাকি, নাকের এমন ফুঁসফাঁস শব্দ হচ্ছে কেন ?'

'এমন জোরে তুমি চিরুনি চালাও মা, লাগে।'

'চিরুনির ঘায়ে মেয়েরা মরে না।' নীরজা নীরসকণ্ঠে উত্তর করলো।

আজ আর মাছ না। তাল নিয়ে এলো পান্নালাল অফিস-ফেরতা।

আকাশের এমন অবস্থা যে, বাজার করা, পার্কে বেড়ানো কোনোটাই সম্ভব হবে না জেনে পান্নালাল এটি করেছে।

রুণি ছুটে এসে বাবার হাতের তাল কেড়ে নেয়।

'আঃ, কী গন্ধ, কেমন কালো মিশমিশে রং!'

'আর ভিতরটাও পাকা সোনার রং।' মেয়ের খুশিতে পান্নালাল খুশি হ'য়ে দুই চোখ বড়ো করলো। 'বড়া করো, ক্ষীর করো, পায়েস করো এর রস পাকিয়ে।'

'আঃ, কতকাল আমরা তাল খাই না বাবা।'

রুণি মসৃণ কালো ফলটির ওপর তার গৌরবর্ণ সুন্দর নাকটা যখন আর-একবার ঠেকাতে গেলো তখন নীরজা চুপ ক'রে রইলো না।

'এই কাঁদছিলি, এই প্রাণে খুশির বন্যা ছুটলো?'

রুণি এতটুকুন হ'য়ে গেলো।

পান্নালাল বুঝলো, মা ও মেয়ে কিছু-একটা নিয়ে ঝগড়া করছিলো এর আগে।

তাই পান্নালাল গলা বড়ো ক'রে বললো, 'তুমি ওকে সারাদুপুর কাজের ফরমাস দিয়ে মেরেছো, কেঁদেছিলো। এখন আমি ওকে এমন একটা রসালো ফল দিয়ে খুশি করছি, তাই দেখে তোমার ঈর্ষা হ'লো নাকি?'

'আঃ, কত কাজ করে মেয়ে তোমার!' নীরজা গলা আরো নীরস করলো। 'কোনো কাজের কথা বলিনি। তা ছাড়া, কী আমি বলেছি, কেন ও কেঁদেছে তোমার জেনে কাজ নেই। মেয়েদের সব ব্যাপারে পুরুষের নাক ঢোকানো আমি পছন্দ করি না।'

পান্নালাল আড়চোখে মেয়ের মুখ দেখছিলো। রুণি মুখ নামিয়ে।

না কি রুণির ভয় হচ্ছিলো, বাবার কানেও মা কথাটা তোলে। রুণি-সম্পর্কে নীরজা যখন খুশি যেমন খুশি এ-ও-তা ব'লে বাবাকেও সতর্ক করতে পিছপা হয় না, রুণির অজানা নেই।

এখন, হঠাৎ বিকেলের প্রসঙ্গটা নীরজা নিজে থেকে চেপে গেলো দেখে রুণির ভালো লাগলো।

'তাল হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকলে পিঠে হবে?'

'আমি কি বলেছি সে-কথা।' রুণি যতটা সম্ভব খুশি গলায় বললো, 'আমি যে তোমার জন্যই অপেক্ষা করছি মা। আজ তোমার কাছে পিঠে তৈরি শিখবো। সব আমি নিজের হাতে করবো। একটা-দুটো শুধু তুমি দেখিয়ে দেবে।'

'শিখছো কোথায়!' নীরজা তখনো অপ্রসন্ন। 'আমি রাতদিন বলছি লেখাপড়া ও বাবার সঙ্গে বেড়াতে যাওয়ার সময়টুকু ছাড়া যতক্ষণ বাড়িতে থাকো এটা-ওটা করতে শেখো। এই সময় শিখবার। পড়লামও না বেড়াতেও গেলাম না, ঘরে চুপচাপ ব'সে জানলার বাইরে পাঁচিলের ওপর শালিক-চড়ুইয়ের নাচানাচি দেখলাম সে একটা কথাই নয়। এর ফল ভালো না।'

রুণি চুপ।

পান্নালাল জামা খুলতে শোবার ঘরে ঢুকলো।

সন্ধ্যাটা কাটছিলো বেশ।

বাইরে রিম্‌ঝিম্‌ বৃষ্টি।

ভিতরে পিঠে ভাজার ছপ্‌ছপ্‌ শব্দ।

আগুনের তাপে রুণির সুন্দর মুখ লাল হ'য়ে গেছে। ওর পিঠের সাপের মতো লম্বা বেণীটাও কিল্‌বিল্‌ ক'রে নড়ছিলো, মাথার ঝাঁকুনিতে হাসির দোলায়। হাসির ধাক্কায় ওর যৌবনপুষ্ট সবটা সুন্দর শরীরই নড়ছিলো। এক-একটা পিঠে সুন্দরভাবে ভাজা হ'য়ে যেতে দেখেই রুণি যে এই বয়সেও এত আনন্দ পাবে, যেন নীরজা ধারণা করতে পারছিলো না।

নীরজা আবিষ্ট চোখে মেয়ের পিঠে-গড়া দেখছিলো।

পিছনে, চৌকাঠ ঘেঁষে পান্নালালের বেতের মোড়া বিছানো। বাইরে রাখা গড়গড়ার নলটাও টেনে আনা হয়েছে ভিতরে। বাদলার সন্ধ্যায় বাইরে বেরুতে না পারলেও রান্নাঘরে ব'সে পান্নালাল মা ও মেয়ে উভয়কেই দেখছিলো আর মনের সুখে গড়গড়া টানছিলো। এমন সময়, হঠাৎ, 'মেয়েদের জীবনটাও পিঠের মতোন। ভাজা মিষ্টি রস রং। চারটে গুণেই ওকে অতুলনীয় হ'য়ে উঠতে হবে। তবেই হবে ওর সার্থক জীবন। ভিতরের স্বাদ গন্ধ রস রং ছাড়া বাইরের সজ্জাটা তার কিছুই না, কোনো মূল্য নেই।' নীরজা আরম্ভ করলো।

মা-র উপদেশ যে-কোনো সময় আরম্ভ হ'তে পারে সেজন্য রুণিও প্রস্তুত ছিলো যদিও।

'ক্লাসের সেরা সুন্দরী মেয়েটি পিঠে গড়তে জানে? না আলাপ তন্দুর গড়ায়নি?' নীরজা প্রশ্ন করলো।

'আমি ওর সঙ্গে এখন পর্যন্ত কোনো কথাই বলিনি।' রুণি ঘাড় তুললো। এবং যেন অনেকটা বাবার দিকে তাকিয়ে তাঁর সহানুভূতি খুঁজলো। নীরজা তাতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হ'লো না। বরং চোখে আরো বেশি জিজ্ঞাসা এবং ভুরুতে পর্বতপ্রমাণ শাসন নিয়ে প্রশ্নক্ষেত্রে অবতীর্ণ হ'লো।

'ওর সঙ্গে আলাপ নেই, তার সঙ্গে এখনো কথা আরম্ভ হয়নি। তবে কি ক্লাসের কোনো মেয়ের সঙ্গে তুই আজ অবধি মিশিসনি?'

রুণি চোখ নামায়।

'রাখো পিঠে-ভাজা।' নীরজা মেয়েকে ধমক লাগায়। 'আমার কথার জবাব দাও।'

'কি কথা?'

'টিফিনের ঘণ্টায় কোথায় থাকো তুমি? কি ক'রে তখন একলা সময় কাটাও?'

'টিফিনের ঘণ্টা ছাড়াও কলেজে ছুটির ঘণ্টা থাকে। পড়ি। তখন একটা বই-টই নিয়ে কমনরুমে ব'সে সময় কাটাই।'

'অন্য মেয়েরা কি করে তখন?'

মা-র জেরার ভঙ্গি দেখে রুণির ম'রে যেতে ইচ্ছে হচ্ছিলো। অসহায় চোখে সে বাবার দিকে তাকাতে পান্নালাল মুখ থেকে গড়গড়া নামালো।

'বড্ডো বিরক্ত ক'রে ওকে মারো তুমি।'

নীরজা কানে তুললো না তা।

'কি কথা বলাবলি করে অন্য মেয়েরা, তুমি যতই বই পড়ো এক-আধবার শুনেছো নিশ্চয়?'

'হ্যাঁ, শুনেছি, শুনছি বৈকি। সিনেমার গল্প, খাওয়ার গল্প, বিয়ে হবে শিগ্‌গির, পাত্রী দেখে গেছে, সব বিষয় নিয়ে গল্প চলে। সুতরাং তুমি তো জানোই, এ-সব আমি পছন্দ করি না ব'লে একটা বই নিয়ে চুপচাপ ব'সে থাকি।'

নিজের উক্তিকে মেয়ে এ-ভাবে সমর্থন করবে নীরজা ভাবতে পারলো না।

যেন এই প্রথম পরাজয় ঘটলো তার রুণির কাছে। তাই সেই পরাজয় ঢাকতে নীরজা সূক্ষ্ম বিষাক্ত ঠোঁটে হাসলো।

'তাই বলো, আর-দশটি মেয়ে যা ভালোবাসে, তা-ই তোমার পছন্দ না। তা ব'লে তুমি যে বই খুলে পড়াতে নিবিষ্ট থাকো, তা-ও না। গল্প করো না কারণ তোমার রুচি অন্যরকম, তোমার ভাবনা আলাদা। কী সেই ভাবনা, বাড়িতেও আজকাল অনেক সময় শুধুই বই হাতে নিয়ে ভাবতে দেখছি ব'লে জিগ্যেস না ক'রে পারছি না।'

'আশ্চর্য মা তুমি!' রুণি ফ্যালফ্যাল চোখে মাকে দেখলো, 'আমার কি একটা নিজস্ব রুচি বা ভাবনা থাকতে পারে না?'

'না, সেই বয়স তোমার হয়নি।' নীরজা ধমকে উঠলো। 'আর-দশটি মেয়ে যা করে, যে-ভাবে ওরা ছুটির ঘণ্টা কাটায় তুমি যদি সে-ভাবে কাটাতে নিশ্চিন্ত হতাম। সে-রকম কিছু দেখছি না ব'লেই তো আমার এত মাথা ব্যথা।'

'আশ্চর্য!' রুণি আর বাবার দিকে তাকালো না। কালো ব্লাউজে ঢাকা বুকের মধ্যে শাদা ঘাড় গুঁজে দিয়ে ও কেঁদে ফেললো। 'আমার সম্পর্কে ক'দিন থেকে তোমার কী যে জানতে ইচ্ছো না হচ্ছে, যদি ওদের কথাবার্তা আমার ভালো না লাগে, তবে কি সেটা অপরাধ হ'লো?'

পান্নালাল আর স্থির থাকতে পারলো না। 'আশ্চর্য, তুমি এমন সুন্দর পিঠে-ভাজা ও পিঠে-ভাজা নিয়ে তোমার ছোটো বেলাকার এত গল্প করতে-করতে হঠাৎ খুকিকে নিয়ে পড়বে আমি ভাবতেও পারি না। তুমি কি জানো না, চিরকালই ও এমনি একটু নিরিবিলি, গম্ভীর।'

'আশ্চর্য তুমি!' নীরজা এবার পান্নালালের দিকে ঘুরে বসলো। 'তুমি কি কোনো সময়েই আমাকে ওকে শাসন করতে দেবে না? তুমি ওর কতটুকু বোঝো, কি দ্যাখো? তুমি পুরুষ, আর ও আমার মতোই আর-একটি মেয়ে, সে-কথা ভুলে যেয়ো না।'

এই একটি অস্ত্র দিয়ে নীরজা রোজ স্বামীকে ঘায়েল করে। তাই কিছুটা অগ্রসর হ'য়েও রুণির জন্যে পান্নালাল আর বিশেষ কিছু করতে পারে না। কাতর চোখে সামনে একটা ফুটন্ত বিস্ফারিত কমল, পাশে সেই কমলেরই আর-একটা পাপড়ির দিকে তাকিয়ে কিছুটা বিস্ময়, কিছু-বা বিহ্বলতা নিয়ে গড়গড়ার নল মুখে তোলে। রুণি উঠে গেলো।

তপ্ত কড়াইয়ে গরম তেল ফুটতে লাগলো।

পিঠে করবার মতো আর কাই ছিলো না।

কিন্তু নীরজা নড়লো না। যেন রুণির উঠে যাওয়ার অপেক্ষাতেই ব'সে।

'আসলে ওর, মেয়েদের সঙ্গে কথা বলতেই শুধু নয়, কলেজটাই ভালো লাগছে না।'

'কি ক'রে বুঝলে ?'

'বেশ নেগ্‌লিজেন্স্‌ চলায় বসায় বেশভূষায়। যেন উৎসাহ নেই, উদ্যমহীন। ময়লা একটা শাড়ি জড়িয়েই সকালে কলেজে ছুটছিলো দেখেছিলে তো ?'

'তাতে তুমি কি এই সিদ্ধান্ত করলে যে, কলেজটা ওর ভালো লাগছে না ?'

'হ্যাঁ, তাই। তুমি টের পাও না, আমি টের পাই। অনেক জল খেয়ে তবে তোমার মতো নিশ্চিন্ত পুরুষ স্বামী পেয়েছি কিনা। শুধুই মেয়ে নিয়ে কলেজে ওর ধাতে সইবে না, আমি আগেই জানতাম। সেজন্যেই ইচ্ছে ক'রে—'

'ও !' যেন অর্থটা অনেকটা বোধগম্য হ'লো পান্নালালের। 'ছেলেমেয়ে একসঙ্গে পড়ে এমন একটা কলেজে ও ভর্তি হ'তে চেয়েছিলো ?'

পান্নালালের কথার উত্তর না দিয়ে নীরজা গম্ভীর হ'য়ে রইলো।

বাথরুমে রুণি হাত-মুখ ধুচ্ছে, তার শব্দ শুনতে নীরজার মতো পান্নালালও কান পেতে রইলো, গম্ভীর হ'য়ে রইলো নল-মুখে, শব্দ নেই।

'আশ্চর্য এক মা-মন।' কান ও থুত্‌নির সাবান ধুয়ে ফেলে রুণি বাথরুমের আয়নায় নিজের ফর্সা ধবধবে মুখ দেখতে-দেখতে ভাবলো কি

ক'রে মা এত চট্ ক'রে মেয়ের মন ধরতে পারছে, রুণির, তার সবে মুকুল আসা বসন্তের প্রথম নিশ্বাস লাগা জীবন, জীবনের ইচ্ছা ভাবনা।

হ্যাঁ, বটে। এখন আবার রুণি মাকে অনুকম্পা করলো।

রুণির এখন মনে পড়েছে, মা এককালে রুণির বয়সে ছিলো।

'তুমি খাবে না?'

'না।'

'তবে দরজায় খিল এঁটে শুয়ে পড়ো।'

রুণি কথা কইলো না।

'মশারি খাটিয়ে শোবে।'

রুণি ঘাড় নাড়লো।

'আমি যাই, আমারও ক্লান্তি লাগছে, এতটা সময় উনুনের ধারে ব'সে থাকা উচিত হয়নি।' নীরজা ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো।

রুণি স্বস্তির নিশ্বাস ফেললো। মা-র উপস্থিতি এতটা পীড়াদায়ক, রুণি আর-কোনোদিন অনুভব করেনি।

রুণির আজ এই প্রথম মনে হ'লো সত্যি সে আলাদা ঘরে আলাদা বিছানায় শুচ্ছে।

বয়েস হয়েছে ব'লে শুধু না, মনের দিক থেকেও মা-র কাছ থেকে অন্তত রাতটা আলাদা থাকবার ভীষণ দরকার হ'য়ে পড়েছে তার। এই প্রথম টের পেয়ে রুণি দরজায় দড়াম ক'রে খিল এঁটে দিলে।

আর তক্ষুনি বিছানায় গেলো না ও।

জানলার কাছে চেয়ার টেনে দুই চোখ ভ'রে অন্ধকার মেঘ দেখতে লাগলো। দুপুরটা দেখা হয় নি।

যেন রুণির এ-সব ভালো লাগাটাই মা-র ভালো লাগে না।

এটা বুঝবার বয়েস হয়েছে রুণির।

তাই, আর মা-র ওপরও বেশি রাগ করলো না।

ভাবুক। মা যে তাকে নিয়ে এত ভাবছে এই ভাবনায়ও সুখ আছে। হ্যাঁ, মা যদি জানতো কেন তার এই মেঘ দেখতে ভালো লাগে, মেঘের মধ্যে এত কী আছে! ভাবতে-ভাবতে রুণি চেয়ারের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়লো।

সকালটা আরো মনোরম। সারারাত বৃষ্টির পর হঠাৎ সকালে আকাশ ভ'রে রোদ উঠলে সেদিক থেকে চোখ সরানো যায় কী।

ঘুম ভাঙার পরও রুণি অবাক চোখে জানলার বাইরে পেঁপে গাছের একটা সবুজ ডাঁটা ও ইলেকট্রিক তারের ফাঁকে মখমলের মতো কোমল নীল আকাশ দেখতে লাগলো।

কিন্তু বেশিক্ষণ জেগে এ-ভাবে শুয়ে-শুয়ে আকাশ দেখতে থাকলে মা এসে এখুনি দরজা ধাক্কাধাক্কি শুরু করবে মনে পড়তে রুণি শয্যা ছেড়ে কাপড় পরলো, হাত দিয়ে মাথার এলোমেলো চুল ঠিক করলো।

ভিতরের দিকে মা আছে অনুমান ক'রে দরজা খুলে রুণি প্রথমে সেদিকে না গিয়ে সোজা চ'লে এলো বারান্দায়।

গড়গড়ার নল ও খবরের কাগজ নিয়ে পান্নালাল একটা চেয়ারে উপবিষ্ট। চা-এর কেট্‌লি, মাখন-রুটি সামনে টেবিলের ওপর রেখে নীরজা আর-একটা চেয়ারে।

'এত বেলায় ঘুম ভাঙলো তোমার?' রুণিকে ভাবতে না দিয়ে নীরজা প্রশ্ন করলো। 'অনেক রাত অবধি জেগে ছিলে নাকি?'

'তা হ'লে ঘরে আলো জলতো। পড়তাম।'

'আলো না জেলে, না প'ড়েও রাত জাগা যায়।'

মা-র মুখের দিকে রুণির তাকাতে ইচ্ছা করছিলো না।

'বোসো, মা।' ঝড়ের প্রথম ঝাপ্‌টা কেটে গেছে মনে ক'রে পান্নালাল সাহস ক'রে চোখ তুললো মেয়ের দিকে।

রুণি বাবার পাশে একটা চেয়ারে বসলো।

নীরজা চা ঢালতে-ঢালতে বললো, 'তোমার এই বিছানায় শুয়ে ভাবার সঙ্গে স্বাস্থ্যের সম্পর্ক অনেকখানি। এখুনি শরীর খারাপ হ'লে পড়াশোনা হবে না। বিয়ে হবে না।'

রুণি ক্ষীণকণ্ঠে প্রতিবাদ করতে যাচ্ছিলো— নীরজা ভুরুর ধমকে মেয়েকে থামিয়ে দিলে।

তারপর নিজের চায়ের কাপে প্রথম সংক্ষিপ্ত চুমুক দিয়ে গম্ভীর গলায় বললো, 'ছেলে হ'লে আমার ভাবনা ছিলো না, মেয়ে তুমি। সেজন্যেই খাওয়া, ঘুম, পড়া ও বেড়ানোর সময়েরও আমি রুটিন বেঁধে দিয়েছি। আমি একদিন মেয়ে ছিলাম। আমি জানি ভালো ট্রেনিং ছাড়া মন তো বটেই, মেয়েদের শরীরও সুন্দর হয় না। সমস্ত স্ট্রাক্‌চারটাই নষ্ট হ'য়ে যায়— কাজেই, যতই অপ্রিয় হোক, তুমি— তোমার বিরক্ত হওয়া সত্ত্বেও আমাকে বার-বার বলতে হবে, মনে করিয়ে দিতে হবে, এটি করবে, ওটি কোরো না, এদিকে হাঁটো, ওদিকে নয়।'

অজস্র রোদ থাকা সত্ত্বেও কালো বর্ডার পরানো শাদা রুমালের মতো মেঘ উড়ছিলো আকাশে অনেক। কিন্তু কী তার দাম! কে তার মূল্য দেয়! সমস্ত সকালটাই মাটি হ'তে চললো।

রুণির আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকার প্রতি একবার দৃষ্টিপাত না ক'রে নীরজা বড়ো চামচের এক চামচ দুধ ও চিনি নিজের কাপে ঢেলে সেটা মেশাতে লাগলো। 'আমি চাই না তুমি সব-কিছু আমায়

খুলে বলো। মনের ইচ্ছে স্বপ্ন যা-ই থাক। সেটা খুব হেল্‌দি হওয়া চাই, সুন্দর।'

'আশ্চর্য! তুমি আমার সম্বন্ধে কী যে ধারণা ক'রে আছো ভেবে পাই না।' রুণি নিরুপায় হ'য়ে কাতর চোখে মা-র দিকে তাকালো।

সেই কাতরতা নীরজা গ্রাহ্য করলো না।

রুটিতে আর এক-প্রস্থ মাখন বুলোতে-বুলোতে বললো, 'মেয়েকে আর একটু ফ্র্যাঙ্ক হ'তে বলো, একটু সরল। বুঝলে?'

'আমি কি বলবো, তুমি ব'লে দাও, তুমি বোঝাও।' নীরজার দৃষ্টি এড়াবার জন্য পান্নালাল খবরের কাগজের ওপর চোখ রাখলো।

রুণির আজ প্রথম মনে হ'লো বাবাকেও সে হারাচ্ছে।

'এই বয়েস তোমার এঞ্জেল হ'য়ে ওঠার, সাপ হবার, সমুদ্রের শামুক কি শঙ্খ হবার। তুমি সংসার নাশ করতে পারো, সাজাতে পারো, তুমি ফুল ফল, আবার ফুল ফলের বুকের কীট।'

ফ্যাল্‌ফ্যাল্‌ চোখে রুণি বাবার দিকে তাকালো।

'আয়নার মতো তোমার ভিতর দেখছি, বাইরেটা দেখছি আমি, আমার চোখকে ফাঁকি দেবে কি!'

দু-ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়লো রুণির দুই গাল বেয়ে।

নীরজা এতক্ষণ পর চুপ করলো। যেন আর-এক কাপ চায়ের ইচ্ছা হ'তে গরম জল আনতে রান্নাঘরে ঢুকলো।

পান্নালাল মেয়ের দিকে তাকাতে রুণি অস্ফুট আওয়াজ বার ক'রে কেঁদে উঠলো।

'দরকার নেই বাবা কলেজে প'ড়ে, তুমি আমায় বিয়ে দিয়ে দাও।'

'না, নীরজা শাসন করতে জানে না।' পান্নালাল অস্ফুট ক্ষুব্ধ গলায় স্বগতোক্তি করলো। 'বাড়াবাড়ি।'

'রাতদিন আমার পিছনে লেগে আছে, আমায় মেরে ফেলবে মা।'

'ছি-ছি-ছি।'

স্বগতোক্তির স্বরে পান্নালাল স্ত্রীর আচরণে ঘৃণা প্রকাশ করলো। এবং সেই মুহূর্তে নীরজা ফিরে এলো।

ছাঁকনির ভিজে চা-পাতার ওপর নতুন গরম জল ঢেলে বেশ কড়া খানিকটা লিকার নিজের কাপে ধ'রে নিয়ে নীরজা বললো, 'পড়া বা না-পড়া যেমন তোমার ইচ্ছেয় হবে না, এখুনি বিয়ে হওয়া না-হওয়াও তোমার ইচ্ছেয় হবে না। এত অল্প বয়সের লেখাপড়া-না-জানা-মেয়েকে বুদ্ধিমান ছেলেরা বিয়েই করবে না।'

অসহায় চোখে রুণি মা-র দিকে তাকালো।

'দিন ঘুরে গেছে রুণি।' নতুন চায়ে চুমুক দিয়ে গলা ভিজিয়ে নীরজা বললো, 'রাজা জমিদার ছেলেরাও এখন বিয়ে করতে পাস-করা বউ খুঁজছে। আর গরিব? সেই ছেলে তো চাইবেই বউ চাকরি করুক। কাজেই, কাজেই ওটি ছাড়া মেয়েদের এখন এক পাই দাম থাকে না। এখন যাবে কোন রাস্তায়?'

এঞ্জেল! সাপ! নীরজা যখন চা খেতে লাগলো রুণি বারান্দার বাইরে চুপ ক'রে তাকিয়ে ভাবতে লাগলো। মা যে তার সম্পর্কে ভেবে-ভেবে এতটা রাস্তা এগিয়ে গেছে এই প্রথম টের পেয়ে ওর সঙ্গে আর একটি বাক্যবিনিময় করার তার স্পৃহা ছিলো না।

তাই, রুণি যেন অবাধ্য হ'য়ে নিজের মনে মেঘ দেখতে লাগলো। রুমালের মতো কালো বর্ডার পরানো পাতলা শাদা ডজন-দুই মেঘের কেলিকোর ওপর ছড়িয়ে পড়া রৌদ্র।

'তোমার অফিসের বেলা হচ্ছে না?' নীরজা পান্নালালের দিকে

ঘাড় ফেরালো। 'দাড়ি কামাচ্ছো তো, মাথার পিছনে তেল দাও না কেন ?'

কাগজের বুকে মুখ লুকিয়ে পান্নালাল ক্ষোভের কণ্ঠে বললো, 'বাপ্‌স, কী কড়া শাসন তোমার, আর কিছুই চোখ এড়ায় না। বুড়ো ধাড়ি আমি। আমারই প্রাণ ওষ্ঠাগত। আর ঐটুকুন মেয়ে রুণি। শাসনের ঠেলায় বেচারা সারাদিন কান্নাকাটি করবে জানা কথা।'

'আঃ, দেখছি তুমিও কান্নাকাটি আরম্ভ করলে শেষটায়। কেন, এখনো তোমার কাগজ পড়া শেষ হ'লো না ? সাড়ে-আটটা বাজলো ; এইবেলা ওঠো, দাড়ি কামাও, তৈরি হ'য়ে বেরুতে-বেরুতেও দেখবে অফিসে লেট্‌ হ'য়ে গেছো।'

অর্থাৎ আর-একটা অস্ত্র হানলো স্ত্রী। পান্নালাল ভগ্নমনোরথ হ'য়ে চুপ ক'রে রইলো।

যেন এবার মেঘগুলো ঘন হ'য়ে রৌদ্রকে ঢাকবার উপক্রম করছিলো।

নীরজা বললো, 'বৃষ্টি হবে, আজ কলেজে গিয়ে কাজ নেই। ছুটির পর সেই তো টিফিনের পয়সা খরচ ক'রে তাড়াহুড়োয় ট্র্যামে-বাসে বাড়ি ফিরবি। কত আমাদের গাড়ি-ট্যাক্সির ব্যবস্থা আছে! আমি তো শুধু শাসন করি, তিনি তোকে কত আদর করেন সেটাও একবার দেখবি।'

অর্থাৎ একদিকের শর নীরজা আর-একদিকে নিক্ষেপ করলো।

পান্নালাল কাগজ ভাঁজ ক'রে উঠে পড়লো। 'না, না, তা না-যাক কলেজে, বাড়িতে আজ রেস্ট্‌ নিক আপত্তি নেই, আমি বলছিলাম তুমি সর্বদা এত বেশি কড়া থাকলে ওর কচি মন—'

'কতটা কড়া কতটুকু নরম হ'তে হবে আমার জানা আছে, এইবেলা তুমি আরম্ভ করো, শেষটায় ঘড়ির কাঁটায়—'

ঘড়ির কাঁটায় গলা গাঁথতে পারবে না— যেন বলার ইচ্ছা ছিলো নীরজার। অফিসে বেরুতে হবে ব'লে পান্নালালকে নীরজা নানাভাবে এমন অনুকম্পা করতে আরম্ভ করে যে সেখানে আর দু-মিনিট অপেক্ষা করার তার উপায় থাকে না।

পান্নালালকে শুনিয়ে-শুনিয়ে নীরজা রুণিকে বললো, 'আজ তোর মাথায় আমি নিজের হাতে সাবান ঘ'ষে দেবো, কতকাল সাবান দিস না।'

'রোজ দিই।' রুণি, মা-র গলায় খানিকটা আদর ছিলো, তাই সাহস ক'রে চোখ নামালো।

'তা হ'লেও ওটা দেওয়া হয় না। আজ আমি নিজের হাতে সাবান ঘষবো। এমন ফুলের মতো অঢেল চুল। যত্ন করলে কত সুন্দর হবে, কেমন ব্রিলিয়াণ্ট দেখাবে তা তোর ধারণা আছে নাকি বোকা মেয়ে।'

রুণি আরো খুশি হ'লো।

বাথরুমে ঢুকবার সময় উঁকি দিয়ে একবার এদিকের দৃশ্যটা দেখে পান্নালাল খানিকটা আশ্বস্ত হ'লো। ভাবলো, মন্দের ভালো তবু যদি নীরু আজ ওর চুল ঘষা-মাজা নিয়ে থাকে, মেয়েটাকে আর না জ্বালাতন করে। —কত আর বয়েস হয়েছে রুণির।

বৃষ্টি এলো না।

দুপুর ভ'রে কালো মেঘের সজ্জা চললো। বুকচাপা নিশ্বাসের মতো মেঘের বুকে লুকিয়ে রইলো শাদাটে রোদের আভা। চুল ছড়িয়ে শুকোতে দেরি হচ্ছে ব'লে মায়ে-ঝিয়ে ছোট্টো খাটের ওপর লম্বা হ'য়ে শুয়ে গল্প করছিলো। ঘরটা রুণির। জানলাটার পর্দা নামানো। কিন্তু আশ্চর্য বদলে গেছে রুণি এই একটা সকালেই। কলেজে গিয়ে কাজ নেই মা বলেছে পর ও একেবারে খুকি হ'য়ে গেছে।

যেন আগের দিনগুলি নীরজা ফিরে পেলো। নীরজা ভয়ানক খুশি হ'য়ে গেলো রুণির ব্যবহারে। এত আদরের, এমন নিকটের জিনিস সন্তান ছাড়া আর কে আছে। তা-ও মেয়ে।

আদর ক'রে রুণি মা-র মাথায়ও সাবান ঘষলো। প্রচুর ফেনা তুললো।

'তোমার চুলই-বা কম সুন্দর কি মা! মেঘের মতো থোকা-থোকা কত চুল!'

একটি গাঢ় নিশ্বাস ফেললো নীরজা। 'আমার আর চুল দিয়ে কী হবে। শেষ হ'য়ে গেছে।'

'কেন?'

'তুই এসে সব কেড়ে নিয়েছিস।'

'আহা, তোমার ওই এক কথা! এখনো তোমায় দেখলে কেউ বলবে না আমি এত বড়ো হয়েছি, তোমারই মেয়ে।'

নীরজা চুপ ক'রে রইলো।

'কী আশ্চর্য পালিশ। পাখির পালকের মতো নরম এখনো তোমার কানের ধারগুলো, গালের চামড়াগুলো।'

নীরজা বললো, 'আমার পিঠে একটু ঘ'ষে দে।'

'মা, এ-বছর তোমার ঘামাচি উঠছে না।'

'না, এবার বেঁচে গেলাম। শীতে একটা পুরো-শিশি অলিভ অয়েল মেখেছিলাম।'

'মনে আছে।' রুণি হাঁটু গেড়ে ব'সে মা-র পিঠে সাবান ঘষতে লাগলো। প্রচুর ফেনা উঠলো। 'আমার অলিভ অয়েল মাখতে হয় না।'

'কেন হবে, এখুনি তোমার চামড়ায় হয়েছে কি। এখনো ফুলের কলির ভিতরের পাঁপড়ির মতোই তুমি নরম র'য়ে গেছো।' নীরজা রুণির

পিঠে সযত্নে সাবান ঘ'ষে দিলো। নিশ্চয়ই, নীরজা রুণিকে দেখলো, নিজেকেও দেখলো, তাবপর আঠারোটা বসন্ত দিয়ে ছত্রিশবার ছত্রিশটা বসন্তকে ভাগ করলো।

খেতে ব'সেও রুণি মাকে কম আদর করলো না।

'বাঃ, সবটা ভাজা আমায় দিয়ে দিলে। তুমি রাখলে কোথায়?' পটল-ভাজাব প্রায় সবটাই ও মা-ব পাতে তুলে দিলো।

'খেয়ে উঠে তোব পায়ে আমি আলতা পরিয়ে দেবো।'

'দিয়ো।' রুণি নিজের পায়ের পাতা দেখে মা-ব পাতা দেখলো। 'মনে হয তোমাব পা আমার পায়ের চেয়ে ছোটো। ভারি সুন্দব সাইজ তোমাব পায়েব।'

নীবজা কথা না ক'য়ে অন্য কথা ভাবলো।

বিছানায় শুয়ে রুণি মা-র গলা জড়িয়ে ধরলো। মিঠে পান এনে খেয়েছে দু জনই। 'আচ্ছা মা, তুমি ভ্যাখো, আমার চেয়ে তোমার ঠোঁট কত বেশি লাল হযেছে। আনবো আবশি?'

আবশি ধ'বে মা-মেযে পাশাপাশি শুযে দু-জনেব সৌন্দর্য তুলনা করলো। চিবুক, ভুরু, নাক, গাল।

'একটু মোটা হ'য়ে গেছি।' নীরজা আরশি নামালো।

'তাতে খারাপ লাগে না,' রুণি মা-র বুকের ওপর হাত রাখলো, 'আমার, যখনই তোমায় দেখি, ভয়ানক লোভ হয়— আমার মতো বয়সে তুমি না-জানি কত সুন্দর ছিলে।'

নীরজা আদব ক'রে মেয়ের কপালে ঠোঁট রাখলো। 'তুই আমার গর্ভের সন্তান।'

প্রায ঘুম পাড়িয়ে দিলে রুণি মাকে মিছিমিছি কথা বুলিয়ে। বাঃ, রুণি একটু-সময়ের ফাঁক চায়, এতটুকু নিরালা। মা-র কাছ

থেকে ছাড়া পাওয়ার এই প্রথম মন্ত্র রুণি আজ নিজের অভিজ্ঞতা থেকে শিখলো। আর শিখে এক নতুন অনুভূতিতে তার সর্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হ'য়ে উঠলো।

নীরজার তখন নাক ডাকতে শুরু করেছে, নিঃশঙ্কচিত্তে রুণি শয্যা ছেড়ে উঠলো। উঠে এলোমেলো কাপড় গুছিয়ে সুন্দর ক'রে পরলো।

চুল ঠিক করলো আয়নায়, তারপর এসে দাঁড়ালো বারান্দায়। পড়ন্ত রোদ মেঘের ধারগুলোকে জাফরানি বর্ডার দিয়ে মুড়ে দিয়েছিলো ততক্ষণে। আশ্চর্য এক আকাশ।

রেলিং-এ ভর দিয়ে রুণি আকাশের গায়ে একটা হল্‌দে ঘুড়ি ও একটা বেগ্‌নি ঘুড়ির খেলা দেখলো কতক্ষণ।

না, নিচে রাস্তা দিয়ে কত লোক এলো গেলো, আর ওরা এক-একজন মুখ তুলে বৃষ্টি-ধোয়া তাজা রজনীগন্ধার ডাঁটের মতো সুন্দর মেয়েটিকে দেখলো। রুণি কিন্তু একবারও নিচের দিকে তাকায়নি। যেন সময়ই ছিলো না ওর জাফরানি-রং মেঘ হলুদ-রং ঘুড়ি আর দূরের ধূসর-রং চিলের ডানা থেকে চোখ নামিয়ে একবারও মাটি দ্যাখে, ওদের বাড়ির সামনের রাস্তাটার দিকে তাকায়। আর, যখন চোখ নামালো তখন কিন্তু চোখ ফেরাতে পারলো না। আনন্দে উত্তেজনায় কাঁপছিলো ও।

আর সেই উত্তেজনা নিয়েই ও পা টিপে ঘরে ঢুকলো।

একটু শব্দ না ক'রে ড্রয়ার টেনে ওর ছোট্টো হাতবাক্সটা বার করলো।

ডালা তুলে দেখলো একটা রুপোর টাকা প'ড়ে আছে। টাকাটা বাবা দিয়েছিলো ওকে, কি মা, কবে, কি উপলক্ষে, সে-সব একবারও মনে আনবার চেষ্টা না ক'রে সেটি আলগোছে তুলে নিয়ে পা টিপে তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। এইটুকু সময়ের মধ্যে নীরজা একবার পাশ ফিরলো শুধু। জাগলো না।

দ্রুত সিঁড়ি বেয়ে রুণি নিচে নেমে এলো।

'নমস্কার!'

'নমস্কার।'

'আপনাদের এই বাড়ি?'

'হ্যাঁ।'

'উঃ, কতদিন এখান দিয়ে গেছি।'

'আমি কিন্তু একদিনও দেখিনি।'

'তা সাইকেল চালিয়ে যাই তাড়াতাড়িতে।'

'সাইকেলটা ঠেকিয়ে রাখুন-না রকের গায়ে।' রুণি চৌকাঠ থেকে রকে নামলো।

'হ্যাঁ, তারই চেষ্টা করছি।' যুবক সাইকেলটাকে কোনোরকমে দাঁড় করালো। তারপর পকেট থেকে একটা ময়লা রুমাল বার ক'রে কপালের ঘাম মুছলো। 'এটা কত নম্বর?'

'সাতেরোর বি।'

'জায়গাটা ভালো।'

রুণি শব্দ করলো না। নুয়ে সাইকেলের সামনে পিছনে গাদা ক'রে বাঁধা রং-বেরং-এর নতুন সাপ্তাহিক মাসিকগুলো দেখতে লাগলো।

'সব বেরিয়ে গেছে?'

'হ্যাঁ, মাসের সাত তারিখ হ'তে চললো, বেরোবে না তবে কি।'

' "দেশ" বেরিয়েছে?' রুণি যুবকের চোখের দিকে তাকালো।

'তা আজ বৃহস্পতিবার, কাল—।'

'ওটা কি? অদ্ভুত রং করেছে মলাটের, কাগজটা রেগুলারলি বেরোয় না, তাই দুঃখু।'

'খুব ভালো হয়েছে, নিন।' যুবক টেনে এক কপি বার করলো।

'কত দাম ?' সাগ্রহে হাত বাড়িয়ে কাগজটা তুলে নিয়ে রুণি পাতা ওলটাতে লাগলো।

'এক টাকা।'

'তবে তো একটার বেশি আর রাখা হয় না।' মৃদু হেসে রুণি হাতের টাকাটা যুবকের হাতে তুলে দিলো।

'কেন, আরো দু'টো-একটা মাসিক, ত্রৈমাসিক, সাপ্তাহিক কাগজ বেরিয়েছে। কালকে দাম দেবেন।'

'না, থাকগে।' লোলুপ দৃষ্টিতে সাইকেলের সামনে, কেরিয়ারে গাদা-করা ম্যাগাজিনগুলো রুণি দেখতে লাগলো, 'দেখা যাক, কাল যদি— কাল তো কলেজে দেখা হবেই।'

'হ্যাঁ, আজ বেরোননি বুঝি ? শরীর খারাপ ?'

'না।' রুণি অল্প হেসে বললো, 'একটু কাজ ছিলো বাড়িতে, মা বললো—'

'ও, বুঝেছি।' হাতের টাকাটা পকেটে রেখে যুবক আবার রুমাল দিয়ে কপাল মুছলো। দুই হাতের আস্তিন গুটোতে লাগলো। আবার সাইকেলে চাপছে।

'খুব ঘুরতে হয় ?'

'হ্যাঁ, তা হয় বৈকি।' রুণির পা থেকে মাথা পর্যন্ত একবার দৃষ্টি বুলিয়ে যুবক সাইকেলটাকে সোজা করলো।

'আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে—'

'কি, বলুন—' যুবক রুণির চোখে চোখ রেখে অল্প হাসলো। 'হাসছেন ?'

রুণি বললো, 'না।' যেন হঠাৎ গম্ভীর হ'য়ে গেলো ও। 'রেখা কলেজে গেছে ?'

'হ্যাঁ। ওরও আজ শরীরটা ভালো ছিলো না বিশেষ, না করলাম, তবু তো বেরুলো।'

'আজ আমাদের দু'টোয় ছুটি। এতক্ষণে ছুটি হ'য়ে গেছে। নিশ্চয় বাড়ি ফিরেছে ও।' রুণি বললো, 'কেন, কি হয়েছে ওর ?'

'একটু সর্দি মতো।'

'হ্যাঁ, ক'দিন সমানে বৃষ্টি হচ্ছে তো, সবাই দু'দিন-একদিন ক'রে বেশ ভুগছে।'

'চলি।' যুবক সাইকেলের প্যাড্‌ল-এর ওপর পা রাখলো।

'এখন বাড়ি ফিরবেন বুঝি ?'

'হ্যাঁ।' যুবক চকিতে একবার আকাশ দেখে রুণিকে দেখলো। 'ক'টা বাজে ? দু'টো, হ্যাঁ, দশ জায়গায় ঘুরে-ফিরে সবাইকে কাগজ বিলিয়ে ফিরতে এমন বেলা হ'যে যায় রোজ।'

'এখন গিয়ে বুঝি খাবেন ?'

'হ্যাঁ, স্নান করবো, খাবো।' সাইকেলে উঠতে গিযেও ছেলেটি উঠলো না। রুণির দিকে তাকিযে রুমাল দিযে গলা ও ঘাড়ের পিছন মুছে অল্প-অল্প হাসলো। 'আপনি ভয়ানক ভীরু।'

'কী রকম ?' রুণি হাসি লুকোতে ঠোঁটে ঠোট চাপলো।

'কথাটা আরম্ভ ক'রে থেমে গেলেন।'

'ও, সে-কথা !' রুণি এবার অল্প শব্দ ক'রেই হাসলো। 'ও কিছু না। বলছিলাম সার্ট পরেছেন, চুলগুলো কপালের ওপর লাফাচ্ছে। হেলসিঙ্কি-ফেরত অ্যাথ্‌লিটের মতো লাগছে দেখতে।'

'ও,' ক্ষীণ শব্দ ক'রে হেসে যুবক আবার সোজা হ'যে দাঁড়ায়। 'আমার উপমা আরো সুন্দর।'

'কি ?' রুণি চোখ বড়ো করলো।

'লাল শাড়ি লাল ব্লাউজ পরেছেন। মনে হচ্ছে অলিম্পিকের সেই সুন্দর মশাল।'

'মোটেই না।' রুণির দুই কান লাল হ'য়ে গেলো। 'আমি দেখতে এত সুন্দর নই। আমার গায়ের রংও—' বলতে-বলতে রুণি থেমে যায়।

একটা কর্কশ দীর্ঘ ডাক— 'রুণি!'

রুণি ঘাড় ফেরালো। সিঁড়ির ওপর নীরজা। রুণি ঘাড় সোজা ক'রে পরে আবার এদিকে তাকালো।

'আচ্ছা চলি।'

'রেখাকে বলবেন।'

'নিশ্চয়।' ব'লে ঘাড় নেড়ে যুবক সাইকেল নিয়ে নেমে গেলো রাস্তায়।

নীরজার দিকে রুণিকে এবার ঘুরে দাঁড়াতে হ'লো।

'ওটি কে?'

'দেখতে পাচ্ছো তো, কাগজওয়ালা।'

'তো অতক্ষণ কথা বলছিলে কেন?'

'অনেকগুলো কাগজ এনেছিলো। সবগুলো দেখে রাখলাম। দেখতে সময় লাগলো।'

রুণির হাতের কেনা ম্যাগাজিনের দিকে মোটেই দৃষ্টিপাত না ক'রে নীরজা রুক্ষস্বরে বললো, 'তো কাগজওয়ালার সঙ্গে বিশ মিনিট কথা হচ্ছিলো তোমার?' রুণি বুঝলো তখুনি মা-র ঘুম ভেঙেছে এবং তারপর ঘড়ি দেখেছে এতক্ষণ।

রুণি ঠাণ্ডা, অদ্ভুত শান্ত গলায় বললো, 'আমাদের পরিচিত, শ্যামল চক্রবর্তী, রেখার ভাই।'

'কে রেখা?'

'আমাদের ক্লাসের মেয়ে।'

'তো ওর ভাইয়ের সঙ্গে তোমার পরিচয় হ'লো কখন ?'

'কলেজে কাগজ দিতে যায়।' রুণি বললো।

'কলেজের মেয়েদের সঙ্গেই তোমার ভাব নেই, আলাপ হয়নি শুনি কারো সঙ্গে, তো মেয়ের এই ভাইয়ের সঙ্গে এমন এতটা মাখামাখি—'

'আশ্চর্য, আশ্চর্য তুমি মা,' রুণির মা-র চোখের দিকে তাকাতেও ইচ্ছা হ'লো না, 'তুমি এমন এক-একটা শব্দ বার করো !'

'করতেই হয়, না হ'লে তুমি উচ্ছন্নে যাবে, তোমার সর্বনাশ হবে।'

রুণির সেখান থেকে ছুটে পালাতে ইচ্ছে হচ্ছিলো। কিন্তু পথ রুদ্ধ। নীরজা আর দাঁড়িয়ে নেই, ওপরে যাবার সমস্ত রাস্তাটা বন্ধ ক'রে দিয়ে প্রায় তিনটে সিঁড়িতে পা ছড়িয়ে ব'সে রুণির আপাদমস্তক দেখছে।

'পর্যন্ত হাসাহাসি হয়েছে ওর সঙ্গে !'

অনেকক্ষণ রুণি কথা কইলো না। তার দুই কান লাল।

'কথা বলছো না কেন ?'

'বাঃ, আমরা সবাই তো শ্যামলের কাছ থেকে কাগজ কিনি, মা।'

'কেন, তিনি কে ?'

'বি-কম্ পড়ছে। রাত্রে। দিনের বেলা কাগজ বিক্রি ক'রে ও ট্যুইশনি ক'রে নিজের ও রেখার পড়ার খরচ ও রেখাদের সংসার খরচ চালায় এই ভাই।'

'ও, সাহায্য করছো সবাই গরিব ছেলেকে। তাই ম্যাগাজিন কেনার ধুম প'ড়ে গেছে।'

বড়ো-বড়ো চোখ তুলে রুণি মাকে দেখলো।

'সেজন্যই বলি সাবধান হও।' নীরজা তিক্তস্বর বার করলো, 'শেষ পর্যন্ত এই তোমার সিলেক্শন, এই চয়েস, ছি-ছি—'

'উঃ।' আবারও কি প্রতিবাদ করতে চাইছিলো রুণি, নীরজা ধারালো ভুরু দিয়ে রুণির সেই প্রতিবাদ খান-খান ক'রে কেটে দিলে।

'আর সবাই সাহায্য করছে কিন্তু তুমি সকলের চেয়ে বেশি এগিয়ে গেছো, তোমার উৎসাহটি সবার চেয়ে বেশি। এবং আমি অন্ধের মতো বলতে পারি তুমি শ্যামলের সঙ্গে প্রেম করছো, শ্যামলকে চাইছো, ওর শরীরের মনের কাছ ঘেঁষে বেশিক্ষণ থাকার ইচ্ছের চেয়ে পৃথিবীতে এমন আর অন্য-কোনো ইচ্ছে আছে তোমার ?'

'মা !'

'না, আর মা নয়। আমার আর জানতে বাকি নেই, আয়নার মতো তোমার মন দেখতে পেলাম। আসুক আজ কর্তা। ইউ আর মেকিং লভ্ উইথ্ এ হকার, একটি ফেরিওয়ালা ছেলের সঙ্গে প্রেম করছো—'

'ছি ছি ছি মা, তুমি কী নীচ !'

'চুপ, আমার জানতে বাকি নেই,' নীরজা গর্জন ক'রে উঠলো, 'তোমার মধ্যে কি আছে, কতটা প্যাশন ওই শরীরে, আমার চেয়ে বেশি বোঝো ? তুমি চুপ করো, বেশি বাড়াবাড়ি করলে কর্তাকে বলবো। আয়নার মতো তোমার সবটা ভিতর আমি দেখতে পাচ্ছি।'

কান্নায় রুণির বুকের ভিতর ভেঙে যাচ্ছিলো। আজ তার কোনো উৎসাহ ছিলো না, বাবা তাল নিয়ে ফিরবে কি মাছ নিয়ে, আকাশটায় আর-এক ফোঁটা রং নেই কোথাও। সবটা সীসে রং-এর মেঘে মোড়া।

'এত বড়ো একটা কথা যে লুকিয়ে রাখতে পারে সে খুন করতে পারে, ছোরা বসাতে পারে বাপ মা-র বুকে,' মেঘের মতো গুম্‌গুম্ আওয়াজ হচ্ছিলো নীরজার গলায়, 'তোমার জাতের মেয়েরা সংসারে কী না করেছে !'

///////////////////////////////

দুপুরে গল্প

///////////////////////////////

দুপুরবেলা দু-জন এসে এখানে বসে।

দুই বাড়ির মাঝখানে এইটুকু ফাঁকার দাম বেশি। তাই বাড়ি দু'টোর অবস্থার অসীম ব্যবধান থাকা সত্ত্বেও দুই বাড়ির দুই গিন্নী পৌষের রোদে গা মেলে দিয়ে লাল রকটুকুর ওপর পা ছড়িয়ে বসে, সারা দুপুর গল্প করে আর অন্ধকার গলির মাঝামাঝি একটা জায়গায় জটলা-করা দশ-এগারো বছরের অনেকগুলো ছেলেমেয়ের লাট্টু-গুলি খেলা তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখে।

কমলা জাঁদ্রেল অফিসারের গিন্নী।

বিমলা কেরানী-ঘরণী।

কমলার গায়ে দামী শাল। বিমলা একটা লাল সুজ্‌নি জড়িয়ে।

কিন্তু তা হ'লেও দু-জনের বয়স এক। সবে ত্রিশ অতিক্রান্তা।

আর কমলার গায়ের রং যেমন দার্জিলিং-এর সুপক্ক কমলালেবুর কোয়ার রোঁয়ার মতো উজ্জ্বল সুন্দর, তেমনি বিমলাকেও দেখে আপনি অসুন্দরী বলতে পারেন না। কমলাক্ষী। মাথায় এত বড়ো ভ্রমরকৃষ্ণ খোঁপা।

বয়সের মিল, দু-জনের রূপ, পৌষের দুপুরের মুড়ি-গরম রোদটুকু ও অদূরে কিশোর-কিশোরীদের কলকাকলীর মতো আর-একটা জিনিসের মিল এসে দু-জনের মধ্যে বাসা বেঁধেছিলো।

কমলা ও বিমলা নিঃসন্তান।

তাই দু-জনের সখিত্ব।

সারা দুপুর ছেলে-হওয়া না-হওয়ার গল্প নিয়ে দু-জন বুঁদ হ'য়ে থাকে আর অদূরে ক্রীড়ারত চঞ্চল এক-ঝাঁক শিশুকে ছ্যাখে।

হ্যাঁ, দু-জনের এত বড়ো এক-একটি অ্যাদ্দিনে হ'য়ে যেত। আরো বেশি।

কিন্তু কমলার যেমন সেই সম্ভাবনা নেই, বিমলাতেও তা প্রকটভাবে অনুপস্থিত।

এই নিয়ে দু-জনে পরস্পরকে প্রশ্ন করার শেষ নেই।

'হ্যাঁ, বিমি, তোর যে ছেলেপুলে হচ্ছে না, স্বামী রাগ ক'রে কি মাঝে-মাঝে বলে না, "ধুত্তুর ছাই আর-একটা বিয়ে করবো।" '

কমলার প্রশ্নে বিমলা চমকায় না, বরং হাসে। বলে, 'বলেছিস ভালো। মহাখুশি ঘরে বাচ্চা নেই ব'লে। রেশন কম লাগে, ছোটো ঘর নিয়েও আরামে থাকা যায়, লেখাপড়া শেখানো জামাকাপড়ের খরচা একদম বাদ। এই চাকুরিতে এত আরাম তুমি পেতে নাকি যদি একটি-দু'টি এসে যেত।'

কমলা হাসলো অন্য অর্থে।

'আমার তিনি বাচ্চা নেই ব'লে মনে-মনে মহাখুশি। আর-একটা বিয়ে করার ইচ্ছে।'

'পুরুষজাতটাই ও-রকম।' বিমলা গুম্‌গুমিয়ে উঠলো, 'স্বার্থপর, তুই ডাক্তার দেখিয়েছিলি ?'

'সব, সবরকম চেষ্টা করা হয়েছে বিমি। ও-সব ওষুধ-বিষুদের কাজ না, ঈশ্বরের দয়া।' ব'লে কমলা চুপ করলো।

বিমলা বললো, 'আর হয় না কমল, আমি কি চেষ্টার কম করেছি ! পয়সার জোর নেই ব'লে বড়ো ডাক্তার দেখাতে পারিনি, কিন্তু হোমিও-প্যাথি তুকতাক জলপড়া পানপড়া শিকড় ও মূলই কী কম খেয়েছি !

ওষুধটা আসলে কিছু নয়। চাওয়া। স্বামী অন্তর থেকে চাইছে না ব'লেই আমাদের সন্তান হচ্ছে না।'

বিমলার কথাটা কমলা অস্বীকার করতে পারলো না।

বিমলার স্বামী অভাবে আছে। সন্তান চাইছে না। কমলার কর্তারও হয়তো কমলাতে মন নেই, অন্য দিকে উড়ুউড়ু করছে, তাই ওর গর্ভে আজো ছেলে-মেয়ে দেখা দিচ্ছে না।

'সত্যি, একটি-ছু'টির ভয়ানক সাধ ছিলো।'

এবার বিমলা বললো। কথাটা শেষ ক'রে ফোঁস ক'রে ও দীর্ঘশ্বাস ফেললো। তারপর কমলার মতো চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে লাটিম-গুলি খেলোয়াড়দের দৌড়ঝাঁপ দেখতে লাগলো। ছু-জনের বুকের মধ্যে শিশুদের চঞ্চল পায়ের শব্দের মতো দুবদাব শব্দ হ'লো কতক্ষণ।

সারাটা পৌষ মাস দুই সখী এ-ভাবে কাটালো। সারাটা মাঘ কাটলো।

তারপর এলো ফাল্গুন। সুন্দর ঝকঝকে উজ্জ্বল এক-একটা দুপুর। বসন্তে মধ্যযৌবনের রূপ ফেটে পড়ছিলো দুই বাড়ির গৃহিণীর দেহে।

এবং ছু-জনে সেদিনও হাত ধরাধরি ক'রে দাঁড়িয়ে পাশের বাড়ির ছেলে-মেয়েগুলোকে খেলতে দেখছিলো। এমন সময় এসে দাঁড়ালো বেদেনী।

ভিন্‌দেশী মেয়ে।

মাথায় এতবড়ো একটা বেতের ঝুড়ি। পিঠে বোঁচকা। দুই হাতে কনুই পর্যন্ত পৃথিবীর যাবতীয় রং-এর কাচের চুড়ি, সেলুলয়েডের চুড়ি ও প্লাস্টিক।

কমলা ও বিমলার মুখের সামনে থমকে দাঁড়ালো বিদেশিনী। দাঁড়িয়ে এক লহমা দুই সখীর আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করলো, তারপর মুচ্‌কি হেসে বললো, 'তোহারা অসুখ আছে বোন, দাওয়াই লাগবে।'

'না, না, আমার কোনো অসুখ নেই, দাঁতের পোকা তো ?' কমলা চেঁচিয়ে উঠলো, 'ওদিকে ছাখো।'

'আমারো কান পাকেনি বাপু, তুমি এখান থেকে বিদেয় হও।' বিমলা বিরক্ত হ'য়ে বললো।

বেদেনী তথাপি ঠোঁট টিপে হাসছে, নড়ছে না।

সুর্মা-পরা এক চোখ বোজা রেখে আর-একটা চোখ দিয়ে কমলার বুক পেট ও বিমলার বুক পেট উপর্যুপরি কয়েক বার দেখা শেষ ক'রে হাতের পাঁচটা আঙুল শূন্যে তুলে বললো, 'বল, আমি অসুখ সারিয়ে দিচ্ছি, পান্‌শ' তন্‌খা ক'রে দিবি বোন দু-জনে। টুকটুকে সোনার চাঁদ ছেলে আ-বে কোলে।'

কমলা চমকে বিমলাকে দেখলো।

বিমলা কমলার চোখ দেখলো।

তারপর দু-জন অস্ফুট আর্তনাদের স্বরে বললো, 'মাগী অসুখ ঠিক ধরেছে, ওমা বলে কি!'

হ্যাঁ, হ্যাঁ, আজই সে টাকা চাইছে না। এবার দশটি আঙুল শূন্যে ঘোরানো শেষ ক'রে মাথার ঝুড়ি নামিয়ে বেদেনী কমলা ও বিমলাকে বসতে ব'লে রকের ওপর ঘাগরা ছড়িয়ে নিজেও জাঁকিয়ে বসলো।

ঝুড়ি থেকে শিকড় বেরুলো। ছ'আনা মোটে দাম। বিশ্বাস করছে না তারা? তবে দেখুক শিকড়-খাওয়া লোকের চিঠি। পিঠের বোঁচকা খুলে একটা ভাঁজ-করা ময়লা কাগজ বার ক'রে দেখায় বেদেনী। কোন এক জায়গার রানিমার ছেলে হচ্ছিলো না। এই শিকড় খেয়ে ছেলে হয়েছে। তার স্বীকারপত্র। রানী নিজের হাতে লিখে দিয়েছেন ওটা বেদেনীকে।

বিমলা কমলার হাতে চিমটি কাটলো।

কমলা ফিসফিসিয়ে বিমলার কানে-কানে কি বললো, তারপর ছুটে ভিতরে চ'লে গেলো।

অর্থাৎ বিমলাও একটা শিকড় কিনুক।

হাতে পয়সা নেই ওর ?

কমলা এখন চালিয়ে দিচ্ছে। ভারি তো ছ'আনা! বারো আনা পয়সা নিয়ে কমলা উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো।

বেদেনী দুটো শিকড় ওর হাতে দিলো।

কমলা বিমলার হাতে একটা তৎক্ষণাৎ গুঁজে দিয়ে বললো, 'মরি তো দু-জনেই মরবো। দেখা যাক না খেয়ে, অনেক তো খেলাম।'

এক জায়গায় দুটো শিকড় বিক্রি করতে পেরে বেদেনীও খুশি। আর বেশিক্ষণ বসলো না ও। উঠলো। যাবার আগে ঘাড় বেঁকিয়ে বললো, শিকড় দুটো বেটে কাল সকালে খালি পেটে ঠাণ্ডা জল দিয়ে যেন দু-জনে খেয়ে ফেলে। টুকটুকে বাচ্চা আসবে দু-জনের পেটে। দশ মাস দশ দিন পর ও ঠিক কলকাতার পথঘাট চিনে এই ব্লাইণ্ড গলির ভিতর মুখোমুখি বাড়ি দুটো ঠিক এসে খুঁজে বার করবে। একটু ভুল হবে না। তখন যেন ওরা ওর ন্যায্য পাওনা মিটিয়ে দেয়। 'হ্যাঁ, পান্‌শ' ক'রে তন্‌খা।'

'হ্যাঁ, দেবো, তুই এখন পালা।' কমলা আঙুল দিয়ে রাস্তা দেখালো। 'আমার সই গরিব মানুষ, টাকা দিতে পারবে না। আমি দু-জনেরটা দেবো। হাজার তন্‌খা। ছেলে না হ'লে ঝাঁটার বাড়ি খেতে হবে কিন্তু।'

ছি-ছি, বলে কী! বেদেনী সুর্মা-পরা ডাগর চোখ দুটো ঘুরিয়ে বললো, জঙ্গলের মানুষ ও। লেখাপড়া শেখেনি। শিকড় বেচে খায়। মেয়েদের পেটে বাচ্চা এনে দেয়া তার পেশা তো বটেই, ধর্মও। এই নিয়ে ছলচাতুরী করলে ভগবান তাকে শাস্তি দেবে। বলতে-বলতে হঠাৎ একটা চোখ

ছোটো ক'রে আর-একটা চোখে হেসে বললো, দু-রকমের শিকড় রাখে সে। দু-জাতের ওষুধ আছে।

'কী ব্যাপার?' একসঙ্গে কমলা ও বিমলা চেঁচিয়ে উঠলো। যেমন সমর্থ মেয়েকে ছেলে উপহার দিতে পারার ওষুধ জানে সে, তেমনি, যে-মেয়ের ছেলে ভালো লাগে না, বাচ্চা-না-হওয়া জীবন পছন্দ করে, সেই ওষুধও রাখে সে। বেদেনী বুঝিয়ে দিলে।

'মাগী বলে কী, ডাইনী ও!' বিমলা মুখে কাপড় চাপা দেয় হাসতে গিয়ে।

'এবার নিজেরটা ব'লে যা, শুনি, তোর কাচ্চাবাচ্চা কি?' মুখরা কমলা প্রশ্ন করলো।

ছুটে পালাচ্ছিলো বিদেশিনী, ঘুরে দাঁড়ালো। ললাটে হাত ছুঁইয়ে ফিক্ ক'রে হাসলো, বললো, 'একটাও না।'

'কেন রে?'

কমলা ও বিমলা অবাক হ'যে প্রশ্ন করলো। ওর স্বামী কি এতই গরিব যে সংসারে একটা বাচ্চা আনার— নাকি তলে-তলে আর-একটা বিয়ে করার ফিকিরে আছে বেদে, একবারও পুরোনো বেদেনীকে আদর করছে না।

বেদেনী হাসিটাকে আরো উচ্চকিত শাণিত ক'রে তুললো। না, না, সে-সব কিছু না।

বাচ্চার লটখটি থাকলে ও শিকড় বেচতে দেশ-দেশান্তরে ফি-বছর আসতে পারতো না।

'স্বামীটা করে কি?' কমলা ও বিমলা প্রশ্ন করলো।

কিছুই না। ঘরে ব'সে বেদেনীর রোজগার খায়-দায় ফুর্তি করে আর ঘুমোয়।

'ও, তার ইচ্ছেতেই তুই বাচ্চা-না-হওয়ার শিকড় খেয়েছিস বুঝি?' রুদ্ধস্বরে কমলা প্রশ্ন করলো।

বেদেনী এবার চুপ হ'য়ে গিয়ে এক-চোখ বোজা রেখে আর-এক চোখে হাসলো।

'এখন বয়স কম, স্বামীর জন্য এতটা করতে ভালো লাগছে, পরে দেখবি সমস্তক্ষণ বাচ্চা-বাচ্চা ক'রে শুকিয়ে মরছিস।'

বিমলার হিতোপদেশ শোনার পরও দেখা যায়, মেয়েটা রাস্তায় নেমে ঘাগরা ঘুরিয়ে শিস দিতে-দিতে মোড় ঘুরে অদৃশ্য হ'য়ে গেলো। যেন গায়েই মাখলে না কথাগুলো।

'হতভাগিনী!' কমলা ফোঁস ক'রে পরে এক-সময় অভিযোগ করলো।

বিমলা বললো, 'তা ছাড়া কি!'

কিন্তু এত আয়োজন ক'রে কেনা ওষুধ ওরা খেতে পারলো কই।

শিকড়ের নাম শুনে বিমলার স্বামী হৈহৈ ক'রে উঠলো।

'হবে না আমি অস্বীকার করছি না, কিন্তু তারপর থেকে যখন ফি-বছর হ'তে থাকবে তখন ঠেকাবে কে। এ-সব ভয়ানক পাজী ওষুধ। তুমি এই কাজটি ক'রে খামোকা নিজেদের বিপদের মুখে ঠেলে দিয়ো না, বিমলা। না খেয়ে-খেয়ে পরে বাচ্চাগুলো পটাপট যক্ষ্মায় আমাশয়ে মরছে তুমি দেখতে পারবে কি? আশ্চর্য, একটা শিকড় থেকে কত লক্ষ অশান্তি সৃষ্টি হচ্ছে তুমি কি তা জানো না!'

কমলার স্বামী শিকড় দেখে শিউরে উঠলো। 'আমি একটা কেস্ জানি কমলা, ভদ্রলোকের স্ত্রী এই ধরনের দিশী ওষুধ শিল-নোড়ায় বেটে খেয়েছিলো পরে, হ্যাঁ, সন্তান হবে না কেন, হয়েছিলো, কিন্তু সেই ক্ষত শুকোয়নি। ভদ্রমহিলা ক্যানসারে মারা যান।'

আর এই ওষুধ খায় কে। কমলাও খায়নি, বিমলাও না।

তারই গল্প করছিলো দু-জন লাল রকে ব'সে পরদিন দুপুরবেলা। পাড়ার ছেলেমেয়েগুলো খেলা করছে দেখতে-দেখতে।

'তারপর তুই কি করলি ওটা?' কমলা প্রশ্ন করলো, 'ওষুধটা ফেলে দিলি? উঃ, ছ'আনা পয়সা কিন্তু আমারই গেলো বিমলা, একেবারে জলে গেলো।'

'পাগল,' বিমলা ঠোঁট টিপে হাসলো। 'সখীর দান আমি এমনি ফেলতে পারি! যখন আমাকে ও কিছুতেই খেতে দিলে না তখন বিড়ালটাকে বেটে খাইয়ে দিলাম, ভাবলাম, যাক, ওরই বাচ্চা হোক।'

যেন কথাটা হঠাৎ ধরতে না পেরে কমলা বিমলার চোখ দেখতে থাকে।

বিমলা বললো, 'কেরানী মানুষ, সপ্তাহে তো দু-দিন মোটে মাছ আসে। তা-ও এবার থেকে মায়ে-ঝিয়ে ওর পাতের দু-টুকরোই খেয়ে ফেলুক। এইসব লোকের এ-ভাবেই শাস্তি দিতে হয়, কী বলিস কমলা? তুমি যে এত ভয় পাচ্ছো সংসারে সন্তান আনতে, বলি, তুমি ওকে খাওয়াবার কে, ওরটা ও-ই সঙ্গে নিয়ে আসতো। ঠিক কিনা?'

কমলা মাথা নাড়লো।

'আমিও শিকড়টা ফেলছি না। জলিকে বেটে খাওযাবো। জলিব তো বাচ্চা হচ্ছে না। হোক। জলির লাগে মাসে ছ'সেব মাংস, এবার থেকে মায়ে-ছেলের লাগুক বারো সের ক'বে মাংস। ওব পযসা কুকুর-বেড়ালেই থাক, আমি চাই না।'

ব'লে কমলা চুপ ক'রে রইলো। জলি ওর কুকুবের নাম।